অবেলায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী



ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
ছবি ভট্টাচার্য
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট অঙ্কন :
অরুণ বণিক

মুদ্রাকর :
শ্রীনিত্যানন্দ পাত্র
ভারতী প্রেস
১৪, হরিপদ দত্ত লেন
কলিকাতা-৬
১৩৪৭

মূল্য : তিন টাকা পচাত্তর পয়সা মাত্র।

আবার তারা তিনজন একত্র হয়েছে।

তিনজনের সঙ্গে আর একজন এসে জুটেছে। চারজন হয়েছে।

যেন এই কটা দিন তারা একজন আর একজনকে হারিয়ে ফেলেছিল। একটি মুখ আর একটি মুখকে ভাল করে দেখতে পায়নি। ভাল করে কথা বলতে পারেনি কেউ কারো সঙ্গে।

কেননা অনেক মানুষ এসে জুটেছিল তাদের সঙ্গে। ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে তিনজন হারিয়ে গিয়েছিল।

বছর বছর অবশ্য এমন হয়।

পূজোর সময়টায় তাদের আড্ডা ভেঙ্গে যায়।

এই সুখের আড্ডা।

হারান মুদির দোকানের পিছনে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ ডালাপালা ছড়িয়ে আছে। গাছের নিচে সারা বছর কিছু না কিছু কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। প্রত্যেকটা বাক্সের মুখ খোলা। ভিতরের খড়কুটোর কিছু অংশ মাটিতে কিছু বাক্সের মুখে এসে জমা হয়ে থাকতে দেখা যায়। রোদে পুড়ে জলে ভিজে সেগুলি বিবর্ণ হতে হতে পচতে থাকে। তারপর একদিন দেখা যায় পুরোনো বাক্সগুলি কোথায় উধাও হয়েছে। আবার নতুন প্যাকিং বাক্স পড়ে আছে তেঁতুলতলার পড়ো জমিতে। সোনালি রঙের নতুন খড় খালি বাক্সগুলির ভিতর থেকে বেরিয়ে কিছু ঘাসের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে কিছু বাক্সের মুখের কাছে এসে জমা হয়ে আছে।

আর সেসব খড় ভাল করে জড়িয়ে পাকিয়ে চমৎকার গদি তৈরি করে একটা বাক্সের ওপর ভল্টু, একটা বাক্সের ওপর সুদাম ও আর একটা বাক্সের ওপর তপা পা তুলে বসে আছে, গল্প করছে, বিড়ি সিগারেট টানছে। দিনের পর দিন।

এবার তিনজনের সঙ্গে আর একজন এসে জুটেছে। হাবু। তপা—তপনের মামাতো ভাই। আসাম থেকে চলে এসেছে। নতুন। তাই একটু মুখচোরা। ভল্টু বা তপার মতন ফরফর করে কথা বলতে পারে না, রাজা উজির মারতে পারে না, হাত পা ছুঁড়তে পারে না। তা ছাড়া কলকাতা শহরের হালচাল কি, শহরের মানুষগুলির চরিত্র মেজাজ ও দশটা সিনেমা ঘরের খবর, খেলার মাঠের সংবাদ হাবুলের জানা নেই। তাই হাবু তিনজনের কথা শোনে আর তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দরকার মতন একটু হাসে মাথা নাড়ে এবং পকেট থেকে বিড়ি কি সিগারেট বার করে নতুন বন্ধুদের সামনে বাড়িয়ে দেয়। ভল্টু তপা সুদাম তাতেই সন্তুষ্ট। আস্তে আস্তে তাদের নতুন সঙ্গীটির মুখ চোখ খুলবে মেজাজ খুলবে তারা জানে। কাজেই আসামের মানুষ বলে হাবু সম্পর্কে তারা মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। হয়তো এর প্রধান কারণ তাদের বয়স। ষোল থেকে আঠারোর মধ্যে ভল্টু তপাদের বয়স। হাবুও তাদের বয়সের। এই বয়সে মানুষ যত সহজে মানুষকে কাছে টানে, যত চট করে একজনকে বন্ধু করে নেয় এমন আর কোন বয়সের মানুষ পারে না। তা না হলে আজ দশ বারোদিন হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত হাবু সেই মফস্বলের মানুষটি সেজে আছে। অর্থাৎ আজও তার পরনে ধুতি পাঞ্জাবি পায়ে পাম্পশু। নাকের নিচে বাচ্চা প্রজাপতির মতন একটুখানি গোঁফ। গাল থুতনি ভল্টু তপাদের মতন কামানো যদিও। কিন্তু মাথার চুল বেশ লম্বা। লম্বা চুল পাট করে ওল্টান। তার মানে আসামের শিলচর শহরের আর দশটি মানুষের চালচলন আদব-কায়দা ভদ্রতা স্টাইল যতটা রপ্ত করার হাবু তা করেছে। কিন্তু তা হলে হবে কি। এটা শিলচর

না। কলকাতা শহর। আবার কলকাতা শহরেও ভয়ানক পুরোনো অথচ মারাত্মক রকমের আধুনিক অঞ্চল বকুলবাগান। ধুতি পাঞ্জাবি পাম্পশু পরা কি বাটারফ্লাই গোঁফ রাখা বা বড় চুল উল্টিয়ে রাখার যুগ যে অনেকদিন মরে হেজে ভূত হয়ে গেছে শিলচরের হাবুলের তা জানবার কথা নয়। অথচ এই শান্তিপুরী ধুতি, গিলেকরা চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবি, প্রজাপতির ছড়ান ডানার মতন চিকন গোঁফ কলকাতা শহর থেকে তাদের শিলচরে একদিন কারা নাকি আমদানি করেছিল হাবুল শুনেছিল আর শুনে তেমন করে চলতে সাজতে শিখে-ছিল। এখন এখানে এসে সে দেখছে সেসব কিছুই নেই। তপা, সুদাম ও ভল্টুর ঘাড় কান একেবারে চাঁছাছোলা। মাথার খুলি-খানটায় দু আনা পরিমাণ চুল আছে। তাও খাড়া খাড়া। তেল-টেল মাথার বালাই নেই। কেউ গোঁফ রাখছে না। প্রত্যেকের পরনে ট্রাউজার হাত গুটানো শার্ট, পায়ে চপ্পল। হাবুলের মতন হাতের কব্জি ঢেকে তারা ঘড়ি পরে না। কব্জি বাদ দিয়ে চার আঙুল ওপরে ঘড়ির ব্যাণ্ড বাঁধে। কথায় কথায় তারা চোখ টেপে, ঠোঁটে আঙুল গুঁজে সিটি মারে। হাবুলের ধারণা ছিল কলকাতার ছেলেরা সর্বদা মাজা-মিহি গলায় কথা বলে, মেয়েদের মতন ঠোঁট টিপে হাসে। এখন দেখছে সে অন্যরকম। ভল্টু তপারা দরকারে অদরকারে উঁচু গলায় হাসে জোরে কথা বলে, প্যাকিং বাক্সের ওপর চাটি মেরে তবলা বাজায়, আর যখন খুশি হয় মুখের ভিতর দুটো আঙুল গুঁজে দিয়ে সিটি দেয়।

পূজার কটা দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে তাদের কেটেছে। পাড়ায় বারোয়ারী পূজা। সুতরাং সকলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে খাতা বগলে নিয়ে চাঁদা তোলা, প্রতিমা বায়না করা, প্যাণ্ডেল বাঁধা, ঢুলি যোগাড় করা, বাজার করা অনেক কিছু তাদের করতে হয়েছে। হয়তো

এক দলের সঙ্গে মিশে তপা গেছে বাজারে, আর এক দলের সঙ্গে ভল্টু গেছে ঢুলির খোঁজে, আবার অন্য এক দলের সঙ্গে সুদাম বেরিয়েছে চাঁদা তুলতে। কাজেই কটা দিন তিনজনের দেখা-সাক্ষাৎ বড় একটা হয়নি। তখন তারা পাড়ার দশজনের একজন হয়ে গিয়েছিল। হারান মুদির দোকানের পিছনের পড়ো জমির বাক্সগুলির ওপর বসে তিন বন্ধুর মনের সুখে গালগল্প করা বিড়ি সিগারেট টানা আর কথায় কথায় হাসা সিটি মারার সময় ছিল না।

এখন পুজো শেষ হয়েছে। আবার তিনজন তাদের জায়গায় এসে মিলেছে। তপার সঙ্গে তার আসামের মামাতো ভাই হাবুলও এসেছে আড্ডা দিতে। তপার বন্ধুরা হাবুলকে পেয়ে খুশি। হোক না মফস্বলের ছেলে, সেকেলে চালচলন, কিন্তু তবু তো তাদের বয়সের আর একটি মানুষ। তারা দলে ভারী হল। দল ভারী হচ্ছে দেখলে তাদের ভাল লাগে।

আড্ডা দেবার পক্ষে হারানের দোকানের পিছনটা চমৎকার। একটু দূরে রাধেশ্যামবাবুর অ্যাসিডের কারখানা। প্যাকিং বাক্সগুলি ঐ কারখানার সম্পত্তি। বাক্সে করে নানারকম শিশিবোতল আসে, আবার শিশিবোতল চালান দিতে বাক্সগুলির দরকার পড়ে। তখন সেগুলি উধাও হয়। এবেলা জায়গাটা ফাঁকা পড়ে রইল তো আবার ওবেলা এত এত বাক্স এসে গেল। তপা সুদামেরা তখন একটা করে বাক্স টেনে নিয়ে ওপরে খড়ের গদি বিছিয়ে বসে যায় এবং আর একটা বাক্সের ওপর পা ছড়িয়ে দেয়। মাঝে মাঝে হাওয়ায় তেঁতুল গাছটা নড়ে ওঠে। তখন শুকনো তেঁতুল পাতা ঝুরঝুর করে তাদের ঘাড়ে মাথায় পড়ে। রুমাল দিয়ে তারা পাতাগুলি সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। পাতা ঝেড়ে রুমালটা ভাঁজ করে গলায় বাঁধে। তিন কোনা করে ভাঁজ করা রুমাল গলায় বেঁধে রাখার ফ্যাশান হাবু এই প্রথম দেখছে। পাঞ্জাবির বুক পকেটে কোনা বার করে রুমাল রাখাটাকে সে এককালে চরম

ফ্যাশান বলে জেনে এসেছিল। কিন্তু তপা ভল্টুরা কখনো জামার পকেটে রুমাল রাখে না। যখন গলায় বাঁধার বাঁধল, নয়তো বাঁহাতের কব্জিতে ঘড়ির কাছে রুমালটা জড়িয়ে রাখে। যেন এও একটা ফ্যাশান। হাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

কদিন তারা আসেনি বলে জায়গাটায় যেন কিছু কিছু আগাছা জন্মেছে। আর এযাত্রায় প্যাকিং বাক্সগুলি অনেকদিন ধরে পড়ে আছে। কাক শালিক হেগে রেখে বাক্সগুলি নোংরা করে রেখেছে। তাই বলো, পূজার কদিন কারখানার কাজ বন্ধ ছিল। তাই মাল-পত্র চালান দেওয়া বা নতুন শিশিবোতলের আমদানি বন্ধ ছিল, তাই আর নতুন বাক্স আসেনি। কিন্তু তা বলে তপা ভল্টুরা মন খারাপ করল না। পা দিয়ে দিয়ে বাক্সগুলি কাত করে নোংরা দিকটা ঘুরিয়ে ভাল দিকটা ওপরের দিকে তুলে দিয়ে তারা নিজেদের আসন তৈরি করে ফেলল। হাবুও একটা বাক্স ঘুরিয়ে নিয়ে বসে পড়ল।

তারপর আরম্ভ হল গল্প।

তারা কি নিয়ে গল্প আরম্ভ করেছিল এবং কোথায় গিয়ে গল্প শেষ করছিল ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

বা তারা যে বিশেষ কোন ঘটনা বা বিষয় নিয়ে গল্প করছিল তা-ও না। পাড়ায় এতবড় একটা পূজা হয়ে গেল। ভুল করেও কেউ পূজার গল্প করল না। দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের পরনে নতুন জামা কাপড় জুতো। বোঝা যায় পূজার সময় কেনা। কাজেই সেই সূত্র ধরে এবার পূজায় ডেক্রন, নাইলন সুতি সিল্কের কেনা-কাটার বহর নিয়ে তারা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারত। কিন্তু সেসব গল্প তারা করল না। শিলচর থেকে গেলে হাবু ও তার সঙ্গীরা তাই করত। এই বয়সে শাড়ি ফ্রক নিয়ে আলোচনা জমে ভাল। কিন্তু তপা ভল্টুরা যেন অন্যরকম।

বকুলবাগানের বারোয়ারী পূজা নামকরা পূজা। কত আলো

জ্বলল মাইক বাজল বাজি পুড়ল। বড় বড় প্রতিমা আনা হয়েছিল। কত বড় মিছিল বার করে প্রতিমা ভাসান দিতে গেল তারা। আশ্চর্য, সেসব কিছুই তপাদের মুখে শোনা গেল না। পুজার খবরই তারা রাখে না।

অথচ তিনদিন ধরে দলে দলে কত মেয়ে এল ঠাকুর দেখতে। কত রকমের বৌ কত রকমের খোঁপা। আর রং-বেরঙের কত সাজ-পোশাক! ভুলেও ভল্টু তপা সুদাম একবার একটি মেয়ের কথা বলল না। হাবু যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। বরং তারা তেঁতুলতলার প্যাকিং বাক্সগুলি নিয়ে কথা বলছিল। তারা গুনে রেখেছিল পূজার আগে বারোটা বাক্স ছিল গাছতলায়। এখন গুনে দেখছে এগারোটা। আর একটা বাক্স কোথায় গেল এই নিয়ে তিন জন তর্ক করছে। 'হারান শালা নিয়ে গেছে।' ভল্টু বলছিল, 'ডাল চালের বস্তা রাখতে সুবিধা হবে। একটা তুলে নিয়ে গেছে।' সুদাম মাথা নাড়ছিল। 'পচা প্যাকিং বাক্স দোকানে ঢোকাতে হারানের বয়ে গেছে। বস্তা রাখবার জন্য সেদিনও হারান একটা বড় বেঞ্চি তৈরি করিয়েছে নিবারণ ছুতোরকে দিয়ে।'

'উঁহু'। তপা বলছিল, 'ঐ শালা অ্যাসিড কারখানার দারোয়ানটার কাজ। বাক্স জ্বালিয়ে ভাত রেঁধেছে।'

'ধ্যেৎ!' ভল্টু ঘাড় নাড়ছিল। 'গোপী সিং ভাত খায় না। দুবেলা রুটি খায়।'

'তুই জানিস কচু।' তপা ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ভল্টুর থুতনির সামনে উঁচু করে ধরল। আমি নিজের চোখে সেদিন দেখলাম গোপী সিং হারানের দোকানে চাল কিনছে। জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল একবেলা সে ভাত খায়।'

ভল্টু চুপ করে গেল। তপার কাছে ভল্টু এভাবে জব্দ হয়েছে জেনে যেন বুদ্ধি করে সুদাম হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনল।

'বুঝলি ভল্টু, আমার মনে হয় কাকগুলো বাক্সের ওপর বসে বসে

কুকর্ম করেছে। আমরা ছিলাম না তো। তাই বেশ আড্ডা জমিয়েছিল নিচে নেমে।'

'মোটেই না।' ভল্টু চোখ ঘোরাল। 'ঐ শালারা তেঁতুলের ডালে বসে থেকে কর্মটি করে গেছে। নিচে নামবে কেন!'

'আলবৎ নিচে বসে হেগে গেছে।' তপা ভল্টুর দিকে তাকায় না, সুদামের মুখ দেখে। 'দেখছিস না নোংরাগুলো তেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়নি। ডালের বড়ির মতো জায়গায় জায়গায় গুটি পাকিয়ে লেগে আছে।'

শুনে সুদাম খুশি হয়, চোখ বড় করে তপার দিকে তাকায়। ভল্টুর মুখটা কালো হয়ে যায়, ঘাড় নিচু করে বাক্সের গায়ের নোংরা-গুলি দেখে। অর্থাৎ এবার তপার জিৎ হয়। তপার কথার প্রতিবাদ করতে পারে না ভল্টু।

'এবার তেমন তেঁতুল হয়নি, গাছটার দিকে তাকিয়ে ছাখ ভল্টা।'

ভল্টু মুখ কালো করে আছে দেখে সুদাম তাকে খুশি করতে চেষ্টা করে যেন। চোখ তুলে গাছের কচি তেঁতুল ছড়াগুলি দেখে। ভল্টু কিন্তু চোখ তুলল না।

'ধ্যেৎ!' তপা ঘাড় তুলে তেঁতুলের ডাল দেখছিল। 'এবার আর তেমন কি তেঁতুল হয়েছে। গেলবারের আগের বার ঢের বেশী তেঁতুল হয়েছিল, কেমন রে ভল্টা।'

ভল্টু ঘাড় নাড়ল ও প্রসন্ন হয়ে তপার দিকে তাকাল।

'ঢের বেশী তেঁতুল এসেছিল সেবার।' কথাটা বলে ভল্টু রীতিমত হাসল ও একটা হাল্কা নিশ্বাস ফেলল। ভল্টুর কথা শুনে সুদাম মুখ কালো করে ফেলল।

'আমার ঠাকুরমা বলে তেঁতুলে বান। যে বছর তেঁতুল বেশী হবে সেবছর বন্যা হবে। গেলবারের আগের বার কত বড় বন্যা হয়ে গেল বিহারে কাগজে দেখিসনি?' তপা ভল্টুর দিকে চোখ রেখে কথা

বলে, সুদামের দিকে তাকায় না। ভল্টু তৎক্ষণাৎ আবার ঘাড় কাত করে।

'কদিন ধরে তো কাগজে বন্যার খবর বেরিয়েছিল।'

'তা বিহারের বন্যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কি ছিল শুনি?' সুদাম চোখ ট্যারা করে, ভল্টু না, তপাকে প্রশ্ন করল। 'তেঁতুল হয়েছিল এখানে, বাংলাদেশে—এখানে বন্যাটা হল কোথায়?'

ভল্টু এবার শব্দ করে হাসল।

'শুনলি তপা, এখন আর বাংলা বিহার বলে আলাদা কিছু আছে নাকি—সবটাই হিন্দুস্থান। এখানেও কংগ্রেস ওখানেও কংগ্রেস। এখানে তেঁতুল গাছে তেঁতুল হলে বিহারের গাছেও তেঁতুল হবে জানা কথা। আর জলের সঙ্গে জলের যোগ আছে যখন তখন এক জায়গায় বন্যা হলেই হল—'

'বটে।' তপা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল। 'তা না হলে বিহারের বন্যায় বাংলাদেশের মানুষ চাঁদা তুলেছিল কেন, তার মানে ওটা আমাদেরও বন্যা।'

সব শুনে সুদাম আর মাথা তুলতে পারছিল না। ভল্টু তপার মুখ দেখছিল। সুদামের অবস্থা দেখে দুজন আর কথা বলছিল না। কতক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। হাবু সব শুনছিল দেখছিল। প্যাকিং বাক্স চুরি যাওয়া, কাকের বাচ্চি, তেঁতুল, বন্যা এবং তারপর তারা কি নিয়ে কথা বলবে সে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

কিন্তু দেখা গেল তারা তাদের কথা ঠিক খুঁজে পেয়েছে। সুদামের গায়ে একটা পোকা এসে উড়ে বসেছে।

তপা চেঁচিয়ে উঠল।

'গুবরে পোকা—গুবরে পোকা!'

'ধ্যেৎ।' ভল্টু ঘাড় বেঁকিয়ে সুদামের জামার হাতা দেখল। একটা কালো গোল পেট মোটা পোকা চুপ করে বসে আছে।

পোকাটা ভাল করে দেখে ভল্টু বলল, 'তোমরা, দাঁড়া একটা মজা করা যাক।' বলে ভল্টু গলায় জড়ানো রুমালটা খুলে ফেলল। তারপর চট করে থাবা বাড়িয়ে পোকাটাকে ধরেই সে রুমালে জড়িয়ে ফেলল। রুমালের ভিতর ঢুবার ধড়ফড় করে উঠে পোকাটা স্থির হয়ে গেল। ভল্টু এবার রুমালটা তপার কানের কাছে নিয়ে গেল। তপা কান পেতে শব্দটা শুনল। চোখ বড় করে দাঁত বার করে সে নীরবে হাসছিল। অর্থাৎ রুমালে আটকান পোকার শব্দ শুনতে খুব মজা লাগছিল।

'আমার হাতে দে, আমার হাতে দে।' তপা হাত বাড়াতে ভল্টু রুমালটা তার হাতে দেয়। তপা রুমালটা সুদামের কানের কাছে ধরল, 'শোন্ কেমন চমৎকার ঝিরঝির আওয়াজ হচ্ছে।'

তেমনি গম্ভীর থেকে সুদাম একটু সময় কান পেতে রইল। তারপর আস্তে আস্তে তার মুখেও হাসি ফুটল, চোখ দুটো বড় হল ও দাঁত কটা বেরিয়ে পড়ল। অর্থাৎ তপার মত সেও মজা পাচ্ছে বোঝা গেল। তপার হাত থেকে ভল্টু রুমালটা নিয়ে নিজের কানের কাছে ধরল। রুমালের ভিতরের ঝিরঝির আওয়াজ শুনে ভল্টুর চোখ বড় হল ও দাঁতগুলি খুশিতে বেরিয়ে পড়ল। তারপর সুদাম হাত বাড়িয়ে রুমালটা নিয়ে আবার কানের কাছে ধরল।

তিন বন্ধুর ঝগড়া তর্ক থেমে গেছে।

এখন তিন জনই খুশি। ভয়ানক মিল তাদের মধ্যে। একজনের হাত থেকে রুমাল নিয়ে আর একজন পোকার শব্দ শুনছে। বা নিজে কতক্ষণ শুনে নিয়ে আর একজনের কানের কাছে সেটা ধরছে। হাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তপা একবার হাবুর কানের কাছে রুমাল ধরে তাকেও শব্দটা শুনিয়ে দিল।

কলকাতার ছেলে! এমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে এত আমোদ পায়, এক জায়গায় জড়ো হয়ে এত বাজে কথা বলে হাবুলের ধারণা ছিল না। আর এতটা সময় শিলচরের ছেলেরা হিল্লী দিল্লী

মেগাটন বোমা চীনের হামলা রকেট টেস্ট খেলা—কত কি নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকত।

তবে কি তাদের এখনও তেমন বুদ্ধিশুদ্ধি হয়নি—এখনও তারা শিশু! হাবুল ভাবল, পরুক না ট্রাউজার শার্ট, কায়দা করে চুল ছাঁটুক আর গলায় রুমাল বেঁধে রাখুক। শিলচরের ছেলেদের জ্ঞানবুদ্ধির তুলনায় তারা অনেক পিছিয়ে আছে।

ইতিমধ্যে ভল্টু রুমাল থেকে পোকাটাকে বার করে দিল। ভল্টুর কোলের ওপর একটু সময় নির্জীব হয়ে বসে থেকে পোকাটা এক সময় উড়ে গেল। উড়ে যাওয়ার সময় মৃদু অস্পষ্ট গুনগুন শব্দ করছিল ওটা। ভল্টু তপা সুদাম হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল। নিম গাছের ঘন পাতার আড়ালে পোকাটা হারিয়ে যেতে তিন বন্ধু একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। যেন তাদের খুব আফসোস হচ্ছিল ওটা চলে যাওয়াতে।

দেখতে দেখতে গাছের মাথায় হলদে রোদটুকু নিভে গেল। কার্তিকের ছোট বেলা শেষ হয়ে কেমন যেন অন্ধকারে ভরে গেল জায়গাটা। এখান থেকে অ্যাসিড কারখানার পিছন দিকের সারি সারি জানালাগুলি চোখে পড়ে। কারখানার ভিতর ইলেকট্রিক বালবগুলি দপ্ করে জ্বলে উঠতে দেখা গেল।

তপা তার মামাতো ভাইয়ের দিকে তাকায়। হাবু শ্যামবাজারে থাকে। সেখানে তার বাবা বাসা নিয়েছে। হাবু সেখান থেকে তপার কাছে আসে আড্ডা দিতে। এখনও শহরের পথঘাট সব চিনে উঠতে পারেনি। একটা বাস-এ সোজা বকুলবাগান চলে আসে। আবার সেই বাস-এ করে বাড়ি ফিরে যায়। আজ একটু অন্ধকার হয়ে যেতে তপা হাবুকে দেখল।

'চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'আমি একলা যেতে পারব।' হাবু দাঁড়াল।

'না বাবা, পরে মামাবাবু মামীমা আমায় বকবেন; কলকাতা

শহর—রাতদিন অ্যাকসিডেণ্ট হচ্ছে। একটা কিছু ঘটে গেলে পরে আমায় গালমন্দ করবে।'

তপার কথা শুনে ও তার চোখ মুখ দেখে হাবু মনে মনে হাসল। কেমন সেয়ানা দেখাচ্ছে এখন তপনকে। অথচ এইমাত্র একটা পোকা নিয়ে কী ভীষণ ছেলেমানুষি করছিল সে বন্ধুদের সঙ্গে। হাবু তপার আর দুটি বন্ধুরও মুখ দেখল।

'কাল আবার চলে এসো ব্রাদার'—ভল্টু ও সুদাম একসঙ্গে বলে উঠল। 'একসঙ্গে বসে গল্প করা যাবে।'

কথা না বলে হাবু ঘাড়টা একটু কাত করল। তারপর তপার সঙ্গে হারান মুদির দোকানের পাশ দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

এবার ভল্টু সুদামের দিকে তাকাল।

'আমাকেও উঠতে হয় সুদে।'

'কোথায় যাবি ?'

'ধরমতলা—সুমির উল কিনতে হবে।'

সুমি—সুমনা, ভল্টুর বোন।

'তাই যা।' সুদাম আস্তে বলল।

ভল্টু উঠল। হাতের রুমাল ঝেড়েটেড়ে নিয়ে তিন ভাজ করে গলায় বাঁধল তারপর শিস দিতে দিতে হারান মুদির দোকানের পাশ দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। এখন আরো অন্ধকার হয়ে গেছে। একলা চুপ করে সুদাম বসে রইল। বসে থেকে সে নিমগাছটা দেখছিল। গাছটাকে আর এখন গাছ মনে হচ্ছিল না, পাতাগুলিকে পাতা মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল একটা খুঁটির মাথায় থোকা থোকা অন্ধকার ঝুলে আছে।

বসে থাকতে থাকতে সুদামের কেমন আলস্য ধরছিল। উঠে দাঁড়াল। হাই তুলল। দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল। ইচ্ছা হল সিগারেট খেতে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল মুখের ভিতরটা কেমন যেন থিতিয়ে আছে। যেন জিভটা পচে

গেছে। সিগারেট না। একটা লবঙ্গ কি দুটো এলাচদানা চিবোলে মুখটা চাঙ্গা হয়ে উঠত। তা হলে অবশ্য তাকে রাস্তায় যেতে হয়, পানের দোকান ছাড়া ওসব পাবে কোথায়। অগত্যা এলাচ লবঙ্গ চিবোনোর ইচ্ছাটা সে বাতিল করে দিল। সিগারেট ধরাল না। একটা সিগারেটই পকেটে আছে। ভল্টু দিয়েছিল। তার পকেটের বিড়ি অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। গোটা ছয় বিড়ি পকেটে নিয়ে তো সুদাম বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

আপাতত কি করা যায় একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে সে চিন্তা করল। তারপর মন স্থির করে ফেলল। দু তিনটা কাঠের বাক্স জোড়া লাগিয়ে চমৎকার তক্তপোশ তৈরি করে ফেলল। জুতোটা খুলে ফেলে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। হাত দুটো ঝুলিয়ে দিল বাক্সের দুদিকে। মাটিতে ছড়ানো খড় তার আঙুলে ঠেকল। খসখস শব্দ হল। চিত হয়ে শুয়ে পড়া মাত্র তেঁতুলপাতার ফাঁক দিয়ে এক ফালি নীলচে আকাশ তার চোখে পড়ল। যেন ওপরটা এখনো তেমন কালো হয়নি অন্ধকার হয়নি। কিন্তু তা না হলেও একটা ফুটফুটে তারা দেখা যাচ্ছিল। বন্ধুরা চলে গেছে। সুদামের মনে হল আর একটি বন্ধু তার এখনো আছে। একদৃষ্টে তাকে দেখছে। দূর আকাশের তারাটাকে হঠাৎ বন্ধু মনে হল কেন, শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করতে লাগল। এদিকে তার ঝুলে পড়া হাত দুটো প্যাকিং বাক্সের খড় ছেনে যাচ্ছিল। কেননা খসখস শব্দটা তার ভাল লাগছিল। ঐ শব্দটা শুনতে শুনতে ও তারা দেখতে দেখতে কেমন যেন একটা অন্য জগতে সে চলে গেল। এখানে হারান মুদির দোকানের পিছনে তেঁতুল গাছের নিচে কাঠের বাক্সের উপর শুয়ে—কথাটা সে একেবারে ভুলে থাকতে পারল। ভুলে থাকতে পেরে তার ভাল লাগছিল। একটা নৌকায় শুয়ে আছে সে। নৌকাটা হেলে দুলে আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছে। তার একমাত্র সঙ্গী ঐ দূরের একটা তারা। এতক্ষণ মাটিতে তার আশে পাশে যে মুখগুলি ছিল তারা অনেকদিন হয়

হারিয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে খুব শীগ্‌গির দেখা হবারও সম্ভাবনা নেই।

অনেকের সঙ্গেই আর তার দেখা হবে না, এই মাটির অনেক কিছু তার কাছে এখন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। যেমন এই বকুলবাগানের একটা ঘিঞ্জি গলির একটা বাড়ির চেহারা সে বেমালুম ভুলে যেতে পারছে। ঐ বাড়ির ভিতর এক বুড়ী থাকে, অষ্টপ্রহর চোখে পিচুটি লেগে আছে আর অষ্টপ্রহর মুখ থেকে "নারায়ণ" "নারায়ণ" একটা শব্দ থুতুর সঙ্গে মিশে বাতাসে ছিটকে ছিটকে পড়ছে। সুদাম সেই বুড়ীর মুখটা এখন চমৎকার ভুলে থাকতে পারল। আর একটি মুখ। হ্যারিকেন জ্বেলে কাগজের ফুল তৈরি করছে এখন। আলোর জোর কম বলে নীল হলুদ গোলাপ রঙের ফুলগুলি অনুজ্জ্বল অস্পষ্ট মনে হয়। অথচ দিনের আলোয় সেগুলি কত ঝকমকে সুন্দর দেখায়। ঐ মুখখানাও এখন মলিন বিষণ্ণ কালি পড়া লণ্ঠনের আলোয় তার হাতের তৈরী কাগজের ফুলের মতো নিস্তেজ ম্রিয়মাণ দেখায়। অথচ দিনের আলোয় ঐ মুখের সামনে যদি কেউ দাঁড়ায় মনে হবে সদ্য ফোটা একটা টগর পাপড়ি মেলে তাকিয়ে আছে। কে জানে, টগর ফুলের মতো দেখতে বলে বাবা মা হয়তো টগর নাম রেখে বসেছিল মেয়ের।

সেই মুখও সুদাম এখন ভুলে থাকতে পারছে। অথচ ওদের ভুলে থাকা কত কষ্ট। অষ্টপ্রহর পিচুটি আঁটা চোখ দুটোর শীর্ণ স্তিমিত দৃষ্টি আর টগরের লম্বা পালক ঘেরা চোখের গভীর চাউনি এমন করে সুদামের বুকে বিঁধে থাকে যে কিছুতেই সে তাদের ভুলতে পারে না। এখন সে অবাক, সেই মুখ দুটো একবারও মনে পড়ছে না, প্যাকিং বাক্সের বিছনায় শুয়ে আকাশের তারাটাকে বন্ধু করে নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। ভাবনাটা তাকে এত সুখ দিতে লাগল যে পরম তৃপ্তিতে ছড়ানো হাত দুটোর মতো পা দুটো নাচাতে আরম্ভ করল। তারপর আস্তে আস্তে শিস দিতে লাগল। অ্যাসিড কারখানার একটা হিস্ হিস্

শব্দের সঙ্গে তাল রেখে সে শিস দিয়ে চলল। ওদিকে তার পা নড়ছিল. হাত দুটো মাটিতে ছড়ানো খড়গুলি খামচাচ্ছিল। খড়ের খস্‌খস্‌ শব্দ হচ্ছিল। ফলে ওধারে রাস্তার গাড়ি ঘোড়া চলার শব্দ, পাশের হারান মুদির দোকান কি ওপাশের হালুই দোকানের মানুষগুলির কথাবার্তা তার কানে আসছিল না। আকাশের একটা নিঃসঙ্গ তারা, নিমগাছের মাথার ঝুড়ি ঝুড়ি অন্ধকার, কারখানার মেশিনের হিস্‌হিস্‌ ও তার মুখের শব্দ ও খড়ের শব্দ দিয়ে এমন একটা নিশ্চিন্ত জগৎ সে তৈরি করে ফেলল যেখানে সুদাম নিজেকে অনায়াসে একটা পাগল, ভূত, পকেটমার, এজরা স্ট্রীটের অন্ধকার গলির ভিড়ে মিশে থাকা গুণ্ডাদের একজন কি তপাদের বাড়ির কাছের ফকির চাঁদ দত্ত স্ট্রীটের দিশি মদের দোকান থেকে রাত নটার সময় টলতে টলতে বেরিয়ে আসা যে-কোন একটি মানুষ, আর যদি ভালমানুষ সৎলোক কল্পনা করা যায় তো—হঠাৎ সুদামের চিন্তা হোঁচট খেল—ভালমানুষ সৎলোক কে আছে তাদের পাড়ায় মনে মনে সে খুঁজতে লাগল। ভল্টুর দাদা? বি এ পাস করেছে, ড্যালহৌসীর একটা অফিসে চাকরি করছে, বিয়ে করেছে সেদিন, অফিস আর বাড়ি এবং বাড়ির একটা ঘরের একটি মেয়ে-মানুষ ছাড়া জগৎ সংসারে যার আর কিছু আছে বলে জ্ঞান নেই; ভল্টুর দাদা ছেন্টুকে সবাই আদর্শ ছেলে সৎছেলে বলে—অথচ সুদামের কেন জানি মানুষটাকে ভাল লাগে না; তার মনে হয়, অফিস থেকে ফেরার পথে, যখন বোয়ের জন্য এটা ওটা কিনে পকেটে পুরে ছেন্টুবাবু তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হন তখন একটা ভিখারি পয়সা চাইলে তিনি তার দিকে ভুলেও তাকাবেন না বা যদি একটা বুড়ো হোঁচট খেয়ে কি গাড়িঘোড়ার ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে যায় ছেন্টুবাবু তাকে তুলে ধরতে বা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে দিতে কি রাস্তা পার হতে সাহায্য করবেন না। অথচ পাড়ার লোক ভল্টুর দাদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভদ্র বিদ্বান অমায়িক। আজকের

দিনে এমন ছেলে কিছু ঘরে ঘরে দেখা যায় না। রাতদিন যে পাড়ার ছেলেরা রকে বসে আড্ডা মারছে, মেয়ে দেখলে শিস দিচ্ছে, প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখেও মুখের বিড়ি সিগারেট আড়াল করছে না, বারোয়ারী পূজোর নামে, থিয়েটারের নামে পাঁচরকম ফাংশন জলসার নামে গা ভাসিয়ে দিয়ে লেখাপড়া শিকেয় ঝুলিয়ে রাখছে সেখানে কেমন করে ছেণ্টুর মত ছেলে হয়! যেন চুপি চুপি সে বি এ পাস করে যেমন—স্বভাবটিও তেমন—বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে যখন কথা বলে তখন তাদের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, বিড়ি সিগারেট দূরে থাক পানটা পর্যন্ত খায় না। এত বড় ছেলে বিয়ে করেছে, দুদিন পর সন্তানের বাপ হবে কিন্তু মাসের পয়লা তারিখ অফিস থেকে মাইনেটি পেয়ে সব টাকা আজও বাবার হাতে তুলে দিচ্ছে। সবই বুঝলাম, সুদাম মনে মনে বলল, তবু আমার মনে হয় ছেণ্টুবাবু মানুষটা ভিতরে ভিতরে স্বার্থপর, মনটা একটুও উদার না, বাবা মা স্ত্রী ভাই বোন ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন মানুষের কথা একদিনও ভেবেছে কিনা সন্দেহ। অথচ আমাদের পাড়ার দ্বিজুকে সবাই খারাপ ছেলে বলে জানত, শয়তান বখাটে দুষ্ট কত কি আখ্যা জুটেছিল তার। একই ক্লাসে দুবার ফেল করার পর তার কাকা (বাবা মারা গেছে) তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনে। তারপর বুঝি তার কাকার এক বন্ধু বাগমারীর একটা হোসিয়ারী মিলে তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে ইউনিয়ন করতে গিয়ে দ্বিজু কর্তৃপক্ষের নেকনজরে পড়ে এবং একদিন তার চাকরিও যায়। তারপর তার কাকা তাকে বাড়িতে ঢুকতে দিত না। কতদিন উপোস কেটেছে দ্বিজুর। পাড়ার লোক তাকে দেখে ছ্যা ছ্যা করত। বলত, এই ছেলে সমাজের কলঙ্ক পাড়ার কুলাঙ্গার; বলত, এখন আর কি, মদ গাঁজা ধরবে, গুণ্ডা বদমায়েশ পিকপকেটের দলে ভিড়বে। সত্যি দ্বিজু শেষ পর্যন্ত মদ গাঁজা ধরেছিল কি না এবং পকেটমারের দলে ভিড়েছিল কি না জানা যায়

নি। কিন্তু এমন একটা কাজ সে করে গেছে যা এ-পাড়ার আর কোন ছেলে, পাড়ার কেন, এত বড় কলকাতা শহরে কটা মানুষ করবে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

দ্বিজুর মুখটা মনে হতে সুদামের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোল। তার পা আর নাচছিল না। হাত দুটোও স্থির হয়ে আছে। নিঃসাড় নিস্তব্ধ হয়ে তেঁতুলপাতার ফাঁকে সে নীলাভ তারা-টাকে দেখছিল। বদ ছেলে বখাটে ছেলে। কিন্তু এই দ্বিজু কতবড় হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে গেছে! সেদিনের কথা মনে করে সুদামের চোখে আজ জল এসে গেল। অথচ সুদাম সেদিন আর দশজনের মতো চোখ শুকনা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল যখন দ্বিজুকে শ্মশানে নিয়ে যায়। না, পাড়ার আর দশটি মানুষের মতো ভানুর জন্য তারও চোখ ছলছল করছিল। দ্বিজুর সঙ্গে ভানুকেও তারা শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। একসঙ্গে দুটি ছেলেকে সেদিন বিকেলে শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু তা হলে হবে কি, পাড়ার ছেলে বুড়ো যুবক যুবতী অসহায় কাতর চোখ মেলে ভানুর মুখখানাই বার বার দেখছিল আর চোখ মুছছিল। কেননা ভানুর বাবা মা তখন পাগলের মতো শবযাত্রীদের পিছু পিছু ছুটছিল, যেন কিছুতেই তারা মরা ছেলেকে শ্মশানে নিয়ে যেতে দেবে না। পাড়ার লোকেরা দুজনকে সান্ত্বনা দিতে যেয়ে নিজেরাই ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। আর দ্বিজু? ভানুর মতো তার মুখখানা কচি ছিল না, বরং এক আধটু গোঁফের রেখা ঠেলে উঠতে আরম্ভ করেছিল গাল ভাঙতে আরম্ভ করেছিল, চোখের কোনে কালির ছোপ দেখা দিয়েছিল। বখাটে ছেলে, অসৎ ছেলে, হয়ত বিড়ি সিগারেট টানত বলে ঠোঁট দুটো কালো হয়ে উঠেছিল। না, একটা মানুষও দ্বিজুর মুখের দিকে তাকায়নি। কেননা দ্বিজুর জন্য শোকের বন্যা বইয়ে দিয়ে পাগলের মতো কেউ শবযাত্রীদের পিছু পিছু শ্মশান পর্যন্ত ছুটে যায়নি। তার কাকা বাড়ি থেকেই বেরোয়নি। কাকীমা

দোরে দাঁড়িয়ে একবার লোক দেখানো চোখ মোছা মুছে তারপর ঘরের ভিতর চলে গেছে আর বেরোয়নি। সুদাম যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল তখন কে যেন এভাবে জলে ঝাঁপ দিয়ে ভানুকে টেনে তুলতে গিয়ে দ্বিজুর ডুবে মরার সমালোচনা করে বলছিল, 'মূর্খের মতো তুই একলা ওকে টেনে তুলতে গেলি কেন, যে লোক ডুবে যাচ্ছে তাকে ধরতে গেলে সে প্রাণের দায়ে তোর গলা মাথা জড়িয়ে ধরবেই—এতবড় ছেলেকে একলা কখনো এই অবস্থায় টেনে তুলতে চেষ্টা করা মানে জেনেশুনে নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া।'

জেনেশুনেই দ্বিজু নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ভাদ্রমাস। গরমের দুপুর। বকুলবাগানের পার্কের দীঘিটায় কানায় কানায় জল ছলছল করছে। আকাশের নীল ছায়া বুকে নিয়ে দীঘিটা যেন হাতছানি দিয়ে মানুষকে ডাকছে তার স্বচ্ছ নির্মল জলে অবগাহন করে শরীর জুড়িয়ে নিতে। তাই হাসতে হাসতে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে পাড়ার প্রসন্ন উকিলের তেরো বছরের ছেলে সেদিন জলের কাছে চলে গেল। ক্লাস এইট-এ পড়ে, মাথায় কালো কোঁকড়া চুল, বড় বড় দুটো চোখ, বাবা মার বড় আদরের সন্তান ভানু। লেখাপড়ায় ভাল, তাই স্কুলে ও পাড়ায় সবাই ছেলের প্রশংসা করে। সেই ছেলের মনে কি ছিল কে জানত। সাঁতার জানে না আর দিব্যি সে জলে নেমে গেল। প্রথমে হাঁটু, তারপর কোমর ডুবল ভানুর। আর একটা সিঁড়ি নেমে গেল। তারপর কি পুরোনো সিঁড়ির শ্যাওলায় তার পা পিছলে গেল, না ভ্যাপসা গরমের দুপুরে এমন ঠাণ্ডা নয়নাভিরাম জলের লোভ এড়াতে না পেরে আরো গভীরে নেমে গেল ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে জলে একটুখানি আলোড়ন হল, শব্দ হল। দীঘির পাড়ের গাছতলায় বসে সুদাম ভল্টু এবং আরো অনেকে ঘটা করে ঘুড়ির সুতোয় মাজা দিচ্ছে, বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটা তো প্রায় এসে গেছে। জলের শব্দ শুনে তারা

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। ভানু ? ভানু ডুবে যাচ্ছে, চিৎকার করে উঠল সব একসঙ্গে। যেন তারা হঠাৎ ভেবে ঠিক করতে পারছিল না কি করবে। অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই ভাল সাঁতার জানত। তপা কি ফ্রি স্টাইল সুইমিং কম্পিটিশনে সেবার ফার্স্ট হয়েছিল না ? ভানু ডুবে যাচ্ছে আর তারা ভাবছে। আর সেই মুহূর্তে দীঘির আর এক পাড়ে গাছতলা থেকে উঠে দাঁড়াল একজন। দ্বিজু। পাড়ার ছেলেরা দ্বিজুর সঙ্গে মিশত না বলে চুপ করে বেচারা একা একটা গাছের নিচে বসে থাকত। দ্বিজু লাফিয়ে জলে নামল। দ্বিজু ভাল সাঁতার জানত। দ্বিজু জলে নামল দেখে সবাই আশ্বস্ত হল। একটা ভয়ের ডেলা তাদের গলার কাছে আটকে ছিল। যেন সেটা নেমে গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে তারা জলের দিকে চোখ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভানুর মাথার চুল ধরে টেনে দ্বিজু তার গলাটা জলের ওপর তুলেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে এমন করে ভানু দ্বিজুকে জড়িয়ে ধরল যে দ্বিজু দুহাত আলগা করে জল কেটে এগোতে পারছিল না। যেন একটু ধস্তাধস্তি হল দুজনে। যেন দ্বিজু ভানুকে কি বলছিল। যেন ভানু ভয় পেয়ে আরো শক্ত করে দ্বিজুর গলা বুক জড়িয়ে ধরল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল হাত আলগা করতে না পেরে দ্বিজু পা দিয়ে জল কেটে কেটে তীরের দিকে আসতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু কতক্ষণ সম্ভব ! দ্বিজুর মুখটা হঠাৎ বিকৃত বীভৎস দেখাচ্ছিল। যেন শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। দম রাখতে পাছিল না। যেন সে ডুবে যাচ্ছে। আর সেই ভয়ে ভানু আরো জোরে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। হয়তো এর নাম মরণ-আলিঙ্গন। আবার একটু ধস্তাধস্তি হল। জলের শব্দ হল। গলা ছেড়ে দিয়ে ভানু এবার দ্বিজুর মাথার ওপর বসেছে। দ্বিজুর গলা ডুবে গেছে। মুখটা মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। একটা প্রকাণ্ড ভারী পাথর হয়ে ভানু তার ওপর চেপে আছে। ভানুও ডুবছে। দেখতে দেখতে তার মুখ কান চুল জলের নিচে চলে গেল। পরপর কটা ঢেউ উঠে জল স্থির হয়ে গেল।

কিন্তু তা হলে হবে কি, আদর্শ ছেলে সৎ লোকদের নামের তালিকায় কোনদিনই দ্বিজুর নাম উঠল না, উঠবে না।

না সুদাম চিন্তা করতে লাগল, আবার এমন মানুষও আছে সংসারে যারা কিছু মানুষের চোখে সৎ কিছু মানুষের চোখে অসৎ। ভল্টুর পিসেমশাই। কত বড় বাড়ি করেছে নিউ সি-আই-টি রোডে। কেউ কেউ বলে কালো বাজার ঘুরে ভল্টুর পিসেমশাই এত পয়সা করেছে। সদানন্দবাবুর নাম তারা শুনতে পারে না। তাদের মতে এই শ্রেণীর মানুষ সমাজের শত্রু, দেশের কলঙ্ক। তা বলুক, আর এক দল পঞ্চমুখে সদানন্দবাবুর প্রশংসা করছে। তিনি ধার্মিক পরোপকারী। ফি বছর দোলের সময় হাজারের ওপর কাঙ্গালী সদানন্দবাবুর বাড়িতে একবেলা পেট ভরে খেয়ে যায়। পয়সা অনেকেরই আছে। কিন্তু সৎ কাজে কয়টা মানুষ তা ব্যয় করে। পাড়ায় ছেলেদের একটা স্কুল খুলে দিয়েছেন তিনি।

কাজেই সৎ অসৎ ভাবতে গিয়ে কেমন যেন একটা গোলকধাঁধায় পড়ে গেল সুদাম। দরকার নেই বাবা সৎ হয়ে, মনে মনে সে হেসে বলল, বরং আমি নিজেকে হাসপাতালের একটি রুগী বলে কল্পনা করছি। হাসপাতালের বেড-এ শুয়ে কোন একটা জানালা দিয়ে আকাশের তারা দেখছি। অসুখ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকার মতো আরাম পৃথিবীতে আর কিছু নেই। রুগীর কাছে মানুষ চেঁচামেচি করে না। সময়মত ঘরে ফিরল না কেন, স্কুল ফাইন্যাল পাস করতে পারল না, বাউণ্ডুলে হয়ে সারাদিন ঘোরে, কাজকর্ম কিছু জোটানোর নাম নেই, সারাদিন বুড়ীর বকর বকর শোনা আর টগরের মুখভার করে থাকার কথা চিন্তা করে সুদাম এখানে মুদি দোকানের পিছনে তেঁতুলতলায় প্যাকিং বাক্সের বিছানাটাকে হাসপাতালের বেড্ কল্পনা করে একটি রুগী হয়ে শুয়ে থাকার গভীর সুখে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করতে লাগল। তাই চিত হয়ে শুয়ে তেঁতুলগাছের মাথায় চাপ

চাপ অন্ধকার আর সেই অন্ধকারের একটি ফুটো দিয়ে ঝকঝকে একটি তারার দিকে চেয়ে সে এখন ঠোঁট টিপে হাসছিল। একবার একটুখানি হাওয়া উঠতে ঝুরঝুর করে কিছু শুকনো তেঁতুলপাতা তার কপালে চোখে ছড়িয়ে পড়ল। বাঁ হাতটা তুলে সুদাম পাতাগুলি মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল। কিন্তু আবার হাতটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আঙুলে মাটির খড় না ঠেকে নরম-মতন কি যেন একটি ঠেকল। ভয়ংকর চমকে উঠল সে। যেন ভয়ই পেল। হাতটা সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাছে তুলে আনল। শুয়ে থেকে কান খাড়া রাখল সে। খড়ের ওপর দিয়ে খচমচ শব্দ করতে করতে একটা কিছু ছুটে যাচ্ছে সে টের পেল। অবশ্য দু এক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার ভয়টা কেটে গেল। ভল্টু যে-বাক্সটার ওপর পা ঝুলিয়ে একটু আগে বসে গেছে ছুঁচোটা যেন সেই বাক্সের ভিতর ঢুকে পড়েছে। বাক্সের ভিতর চিঁচিঁ শব্দ হল একবার।

একটা ছুঁচো সুদামকে ভয় খাইয়ে দিয়েছিল। মনে মনে হেসে এবার সে উপুড় হয়ে শুয়ে ওপাশে কাত করে রাখা বাক্সটার দিকে চেয়ে রইল। দু হাতের ওপর থুতনির ভর রেখে একভাবে তাকিয়ে থেকে মুখ খোলা বাক্সটার অন্ধকার গহ্বরে ছুঁচোটাকে দেখা যায় কিনা ভীষণ মনোযোগ দিয়ে সে পরীক্ষা করতে লাগল। তা কি আর দেখা যায়, ছুঁচোর গায়ের রং আর অন্ধকারের রং একরকম তাই সব লেপা-পোঁছা হয়ে একাকার দেখাচ্ছে। কিন্তু তা হলেও সুদাম কথা বলতে আরম্ভ করল। যদি শিলচরের হাবুল এখন উপস্থিত থাকত তো সুদামের রকমসকম দেখে হেসে খুন হত। কলকাতার ছেলে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ছুঁচোর সঙ্গে দিব্যি আলাপ জুড়ে দিয়েছে চমৎকার।

'কি বললি, এই ব্যাটা ছুঁচো, চুপ করে গেলি কেন'—

'মেয়েটা সরল, বোকা—তাই—' ছুঁচো আবার হঠাৎ চুপ।

'এই ব্যাটা, বল্—বলে ফেল্—' সুদাম চাপা গলায় গর্জে উঠল। 'বোকা কেন শুনি?'

কোঁৎ কোঁৎ শুধু শোনা গেল বাক্সটার মধ্যে। যেন ছুঁচোর হাসি পেয়েছে চেপে রাখছে। তা হলেও পেটের হাসি কিছু কিছু গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে বলে এমন বিশ্রী আওয়াজটা হচ্ছে।

সুদামের দু কান গরম হয়ে উঠল।

'আমায় ভালবাসে বলে বোকা বলছিস তুই ?'

'হুঁ।'

'কেন আমি কি—আমি কি—' কথাটা শেষ না করে সুদাম দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। যেন কি একটু ভাবলও সে সঙ্গে সঙ্গে। তার পর হঠাৎ তার রাগের ভাবটা হুস্ করে কেটে গেল। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ যেমন ফরসা হয়ে ওঠে তেম্নি সুদামের মন মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই সে খুশি গলায় বলল, 'তা বোকা হতে পারে—কিন্তু, আমায় যে ও ভালবাসে এটা তুই স্বীকার করছিস—কেমন না ?'

ভল্টুর বাক্সের ভিতরটা নীরব।

সুদাম এবার উঠে বসে তবলায় চাটি মারার মতো কাঠের বাক্সটা ঠুকতে আরম্ভ করে দিল। অ্যাসিড কারখানার শব্দটা একটু আগে থেমে গেছে। আলোর জোরও কমে গেছে। বোঝা গেল কারখানা ছুটি হয়েছে। আজ বোধ করি আর নাইট শিফ্ট-এর কাজ নেই। এখুনি ওদিকের জানালাটা বন্ধ হয়ে যাবে। সুদাম ওপরের দিকে তাকিয়ে একটু হতাশ হল। তারাটা সরে গিয়ে তেঁতুলপাতার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তার হাত দুটো সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল। বেশ একটু রাত হয়ে গেল না ? ভাবল সে, হারান মুদির দোকানের বেচাকেনায় নিশ্চয় এখন ভাটা পড়েছে। তেমন গোলমাল শোনা যাচ্ছে না। তবে তো তাকে এখন উঠতে হয়। না হলে বুড়ী ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেবে। টগর অবশ্য কিছু বলবে না। মুখ ভার করে থাকবে। টগরের মুখভারটা আরো অসহ্য।

'শোন—' সুদাম বাক্সটার দিকে চোখ ফেরাল। 'ভেতরে আছিস না চলে গেছিস ? আমিও এখন চলে যাব।'

বাক্সের ভিতর চিঁচিঁ শব্দ হল।

অল্প শব্দ করে সুদাম হাসল।

'আছিস্ তো এমন চুপচাপ কেন—হুঁ, আজ আমায় ও ভালবাসে বলে তুই ওকে বোকা বলছিস—এ মাসটা যাক, তখন তুই আবার ওকে বুদ্ধিমতী বলবি।' একটু থেমে সুদাম পরে বলল, 'তখন তুই ওই মেয়েকে হিংসা করবি।'

ছুঁচো আবার বিশ্রী কোঁৎ কোঁৎ আওয়াজ করে হাসল।

'ও মাসে রাজা হয়ে যাচ্ছ বুঝি থুড়ি রাজ্যপাল ?'

'কি হই তখন তো কানে শুনবি—চোখ থাকলে চেয়ে দেখবি।' বাক্সটা লক্ষ্য করে সুদাম একদলা থুথু ফেলল। 'সুদাম দত্ত তোর মতো চিরকাল কিন্তু ছুঁচোমি করে বেড়াবে না, বেকার বাউণ্ডুলে হয়ে থাকবে না।'

'ভাল ভাল, রাজ্যপাল হলে আমায় এক পাউণ্ডের একটা পাঁউরুটি খাইয়ে দিও।'

'রাজ্যপাল হই কি বিড়লা হই তখন দেখবি—ঠাট্টা করছিস।' সুদাম দাঁতে দাঁত ঘষল। 'পাউরুটি না জুতোর সুখতলা খাওয়াব।'

'না আমায় আর কিছু দিতে তোমার মন উঠবে কেন, দিও তাকে—যাকে—'

'পথে এসো বাবা পথে এসো।' সুদাম ঘাড় উঁচিয়ে চারিদিকটা দেখে নিল। কে জানে কেউ অন্ধকারে ঘুপটি মেরে বসে থেকে প্রাণের কথাগুলি শুনছে কিনা—মানুষের মতো কাউকে দেখা যাচ্ছে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সে কেবল ছুঁচোটা শুনতে পায় গলার স্বর এমনভাবে নামিয়ে দিল, 'হুঁ, তার জন্যই তো সব, তাকে পাব তার মন পাব বলে না এতসব কাণ্ডকারখানা করতে হচ্ছে।'

'ভাল ভাল।' ছুঁচো কোঁৎ করে বড়রকমের একটা ঢোক

গিলল। 'তা ওদের দিকেও তাকিও—তোমার ঠাকুমা বুড়ী, তোমার বোন টগর। তারা আশা করছে তুমি বড়মানুষ হলে তারা একটু সুখে থাকবে।'

'বলে কিনা মার চেয়ে মাসির দরদ বেশী—তাদের দিকে তাকাই কি না-তাকাই তোর কি হারামজাদা!' ছুঁচোটাকে লক্ষ্য করে আচ্ছা করে একটা ভেংচি কেটে সুদাম উঠে পড়ল।

কারখানার ওদিকটা এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। সব কটা আলো নিভিয়ে দিয়েছে দারোয়ান। হারান মুদির দোকানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে সে যখন রাস্তায় নামল দেখল লোকজন কমে গেছে—গাড়িটাড়ি কম চলছে। পানের দোকানের ঘড়িতে সাড়ে নটা বেজে গেছে। হঠাৎ টগরের চোখ দুটো মনে পড়ে গেল তার। লাল হয়ে গেছে চোখ। এক একবার ঘুমে ঢলে পড়েছে। হঠাৎ আবার সামলে নিয়ে সোজা হয়ে বসে কাঁচি দিয়ে কচকচ করে লাল নীল বেগুনী হলুদ কাগজ কাটছে। যেন টগরের মাথা ভাঙ্গা কাঁচিটার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটাও সুদামের কানে এল। না না, কাঁচির শব্দ না—একটা গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। করপোরেশনের আবর্জনা ফেলার গাড়ি—এত রাত্রে ধাঙ্গড়টা ওটা কোথায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে চিন্তা করতে করতে সুদাম রাস্তা ক্রস করে ওপারে উঠতে সি. সরকারের প্রকাণ্ড জুয়েলারী দোকানের ঝকঝকে আলো গয়না আয়না আলমারি তার চোখ দুটোকে যেন হঠাৎ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল। চোখ বুজে সে তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে গেল। অবশ্য চোখ বুজলে চোখের জ্বালা কমে। কিন্তু মগজের জ্বালা? রোজ তাকে এখান দিয়ে বাড়ি ফিরতে হয় আর রোজ শো-কেস্-এর গয়নাগুলি তার মাথার ভিতর উননের গনগনে কয়লার চেহারা ধরে জ্বলতে থাকে। এই আগুনের শিখা নেই কিন্তু তাপ প্রচণ্ড। বাড়ি ফিরে তার মনে হয় মাথার আগুন নাভি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। টগরের হাতের প্লাস্টিকের চুড়ি কগাছা দেখে হঠাৎ এমন হয় কিনা

সে বুঝতে পারে না। টগরের হাতে কোনদিন সোনার চুড়ি ছিল কি? চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢালতে ঢালতে সে চিন্তা করে।

ছাইয়ের মতো ভুসভুসে গায়ের রং। নাকটা থ্যাবড়া। চোখ দুটো ছোট ছোট ভূষণ পোদ্দারের। মাথার চুল অর্ধেকের বেশি সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু হ্যাঁ, লোকটা বাবু বটে। যেন এবাড়ি আসার সময় একটু বেশি সাজগোজ করে আসে। এণ্ডির পাঞ্জাবি শান্তিপুরী ধুতি চকচকে পাম্পশু দু হাতের আঙুলে চারটে আংটি। তা নিজের সোনার দোকান আছে যখন চারটে কেন এক ডজন আংটি পরতে পোদ্দার মশায়কে বাধা দেয় কে। কিন্তু সুদামের ভীষণ হাসি পায়! কাঁচাপাকা চুল থেকে চমৎকার একটা তেলের গন্ধ ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যেন এখানে আসার আগে মাথায় একটু বেশি করে তেলটা মেখে ভাল করে চুল পাট করে তবে বাড়ি থেকে বেরোয়। খুব সম্ভব স্নো পাউডারও মাখে। তা না হলে গাজনের সং-এর মত দেখাবে কেন মুখটা। কে জানে, হয়তো ভূষণ পোদ্দারের ধারণা নিজে সে অত্যন্ত সুপুরুষ বা পঞ্চাশ বছর বয়স হলেও নিজেকে এখনও বাইশ বছরের যুবা ঠাওরায়। সুদাম এটা লক্ষ্য করেছে, অনেক বুড়ো মানুষ আজকাল আর নিজেকে বুড়ো বলে মনে করে না। তারা এখনও কুড়ি বছরের কোঠায় আছে ধরে নিয়ে যেভাবে হাসতে হাঁটতে কথা বলতে চেষ্টা করে, তেমনভাবে সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। শুধু তাই নয়, নিজের বয়সের আর দুটো বুড়োকে দেখলে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়ে—বরং যেখানে ছেলে ছোকরারা আছে সেখানে ভিড়ে যেতে চেষ্টা করে। ছেলে ছোকরারা এধরনের বুড়ো-ছেলেদের দেখে কী মনে করে তারা কিন্তু তা একবারও ভাবে না। ভাববার কথাও নয়। বুড়ো হয়েছে কথাটা তাদের মাথায় একবারও আসে না। তা না হলে, সুদাম কদিনই দেখেছে, মেয়েরা যখন বই বগলে করে স্কুলে যায় তখন কোন কোন বুড়ো ভীষণভাবে তাদের দিকে তাকায়,

কেবল তাকানো নয়, সুবিধা পেলে মেয়েদের পিছে পিছে হাঁটতে আরম্ভ করে দেয় বা ট্রামে বাসে কোন মেয়ের দেখা পেলে তার সীটের ধার ঘেঁষে বসে যেতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে।' বুড়োর কাণ্ড দেখে কোন কোন মেয়ে হয়তো মুখ ঘুরিয়ে হাসে—কোন যুবককে দেখে একটি মেয়ে যদি এ ভাবে হাসতো তো যুবকের কান লাল হয়ে যেত, কিন্তু বুড়োরা সেই হাসি দেখতেই পায় না। কেননা মেয়ের মাথার বেণী তার শাড়ি ব্লাউজের রং তার গায়ের কচি কোমল চামড়া তাদের দৃষ্টিকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যে ওর মুখের অবজ্ঞার হাসি ঘৃণার হাসি বিদ্রূপের হাসি কিছুই তাদের নজরে পড়ে না। বরং তারা তখন ভাবে, মেয়েটি না জানি কখন টুক করে তাদের একজনের প্রেমে পড়ে যাবে। বুড়ো বয়সে এক একটা মানুষ অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়। তপাদের সঙ্গে এই নিয়ে সুদাম অনেকদিন আলোচনা করেছে, হাসাহাসি করেছে। তপা ভল্টুরাও স্বীকার করেছে, এরকম একটি দুটি বুড়ো-ছেলে পথেঘাটে রোজই তাদের চোখে পড়ে।

এমন একটি বুড়ো এই ভূষণ পোদ্দার।

মানুষটা যখন আগে বাড়িতে ঢুকত সুদাম ভীষণ রাগারাগি করত ঠাকুমার সঙ্গে। ঠাকুমার বাপের দেশের মানুষ। কালীঘাটে একদিন হঠাৎ আলাপ পরিচয় হয়েছিল। সুদামও সেদিন সঙ্গে ছিল। বছর দুই আগে, কি যেন একটা তিথিতে কালীঘাটে পূজো দেবে বলে ঠাকুমাকে কালীঘাট নিয়ে যেতে হয়েছিল সুদামের। টগরও গিয়েছিল। অসম্ভব ভিড় ছিল মন্দিরে। দু দুটো মেয়েছেলেকে সামাল দিতে সুদামের প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। যা হোক করে ভোগটা দিয়ে তারা যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এল তখন জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। একটা দোকানের খাপড়ার নিচে টগর ও বুড়ীকে নিয়ে সুদামকে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। তখন ভূষণের সঙ্গে তাদের প্রথম দেখা। বুড়ী ঠাকুমা বড় বকবক করছিল। সুদাম

কেন ছাতাটা সঙ্গে আনল না। সকাল থেকেই আকাশে মেঘ করে ছিল। এখন জলের মধ্যে টগরকে নিয়ে কেমন করে বুড়ী 'টেরামে' উঠবে। ' জল কখন ধরবে তার ঠিক কি। এদিকে টগরের শরীরও বেশি ভাল না। টন্‌সিলের দোষ আছে—ঠাণ্ডা লেগে না আবার বড়রকমের একটা অসুখ বিসুখ হয়। এইতো সেদিন 'ইনফ্লুঞ্জা' থেকে উঠেছে। অর্থাৎ হঠাৎ জল আরম্ভ হওয়াতে অসুবিধায় পড়ে গিয়ে বুড়ী মাঝখানে টগরকে দাঁড় করিয়ে তার অসুখ বিসুখের কথা তুলে সবটা দোষ সুদামের ঘাড়ে চাপাতে আরম্ভ করেছিল। যেন ছাতাটা সঙ্গে নিয়ে এলে সব মুশ্‌কিলের অবসান হত। অথচ একটা ছাতার নিচে তিনজন ধরত না। তার মানে সুদামকে জলে ভিজে ট্রাম স্টপের দিকে এগোতে হত। না হয় সে ভিজত। কিন্তু এমন জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল— মাথার ওপর ছাতা থাকা সত্ত্বেও ওরা দুজন ভিজে যেত। বুড়ী কি তা দেখছিল না! হয়তো দেখছিল না। কেননা বুড়ীর চোখে, হুঁ নয়নতারার চোখে ছানি পড়তে আরম্ভ করেছিল। নামটা নাকি দাদুর দেওয়া। আদর করে বুড়ীকে নয়নতারা ডাকত। আজ বুড়ো বেঁচে থাকলে নয়নতারার দুচোখের পুরু পর্দা ও চোখের কোনার গাদা গাদা পিঁচুটি দেখে নিশ্চয় আদরের নামটা পাল্টে দিত। যাক্ গে—সেদিন কালীঘাটের চুড়ি শাঁখার দোকানের খাপড়ার নিচে দাঁড়িয়ে বুড়ীর বকুনি শুনে শুনে সুদাম রাগে ফেটে পড়ছিল, অথচ মুখে কিছু বলতে পারছিল না। আরো পাঁচটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সুদামের ইচ্ছা হচ্ছিল বুড়ীকে আচ্ছা করে ক ঘা বসিয়ে দেয়। কী দরকার ছিল এমন দিনে কালীঘাটে আসার। বৃষ্টি হবে, সকালেই যখন বোঝা গেছে তখন তো বাড়ি থেকে না বেরোনই উচিত ছিল। সুদাম কেন ছাতাটা নিয়ে এল না, এখন সেটাই একটা সাংঘাতিক দোষের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছা করে সুদাম ছাতা ফেলে এসেছে। ট্রামে বাসে এমন ভিড়। সঙ্গে দু দুটো মেয়েছেলে নিয়ে চলা। তার উপর একটা ছাতা বয়ে বেড়ানোর ঝঞ্ঝাট কত। 'তুমি চুপ কর চুপ

কর।' আর চুপ থাকতে না পেরে সুদাম গর্জন করে উঠেছিল। আর যায় কোথা। বুড়ী হাউ মাউ করে উঠলো : 'কেনরে মুখপোড়া, আমি কি তোরটা খাই না তোরটা পরি, বড় যে তুই মেজাজ দেখাচ্ছিস, গলা বড় করছিস—ও টগর, মুখপোড়া বাঁদরটা আমায় কী বলছে শুনছিস—'

টগর ভয় পেল। বাড়িতে যেমন তেমন, রাস্তায় ঘাটে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেবে বুড়ী, একবার রেগে গেলে বুড়ীকে থামানো মুশ্‌কিল হবে। 'ছি ছি, কী লজ্জার কথা, তুমি চুপ কর ঠাকুমা—কত লোক এখানে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কী বলবে'—ফিসফিসে গলায় টগর বুড়ীকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করল : 'বাড়ি গিয়ে যা বলার বলবে—আমিও দাদাকে যা খুশি বলব—এখন না, এখানে না। ছি।'

ফলটা অন্যরকম দাঁড়াল। বুড়ী কাঁদতে আরম্ভ করল। বৃষ্টি যেন তখন আরও জোরে এল। আসলে কি আর টগরের জন্য দুশ্চিন্তা। নিজের জন্যই বুড়ী ভেবে সারা হচ্ছিল। হাঁপানি আছে। এই ঝড়জল গায়ে লাগিয়ে বুড়ীর টান বেড়ে যাবে। কাঁদতে কাঁদতে তাই বলছিল। শুনে সুদামের তখন খুব হাসি আসছিল! বুড়ীকে কাঁদতে দেখে মানুষটি এগিয়ে এল। ছাইয়ের মতো ভুসভুসে রং। থলথলে দেহ। না, সেদিন ভূষণ পোদ্দারের সাজ-পোশাকের তেমন জেল্লা ছিল না। আধময়লা একখানা ধুতি, মোটা লংক্লথের জামা—হাফশার্ট, পায়ে ছিল টায়ারের চপ্পল। মাথাটা ছিল উস্কোখুস্কো। যেন সেদিনও ভূষণ চুলে এমন চমৎকার গন্ধ তেলটা মাখতে আরম্ভ করেনি। আঙুলে একটা মোটে সোনার আংটি ছিল। আর ছিল একটা রূপোর আংটি। পলা বসানো। আজ আর সেই পলা বসানো রূপোর আংটিটা চোখে পড়ে না। রূপোর আংটি পরলে মানুষকে সেকেলে দেখায়, বুড়ো বুড়ো দেখায়। হয়তো এই কারণে ভূষণ সেটা খুলে রেখেছে। দুহাতের আঙুলে এখন তিন চারটে

সোনার আংটি। সেদিন কালীঘাটে দেখা ভূষণ পোদ্দারের সঙ্গে আজ সেজেগুজে ফুলবাবুটি হয়ে হামেশা যে এবাড়ি যাতায়াত করছে তার এতটুকু মিল নেই। কেবল যা গায়ের রংটা আর গায়ের অঢেল মাংস। একই রকম আছে। কে জানে, ছেলেছোকরাদের মতো বাড়তি মাংস কমিয়ে ফেলে শরীরটাকে মজবুত করতে হালকা করে তুলতে ভূষণ লুকিয়ে লুকিয়ে ডনবৈঠক করছে কিনা। হুঁ. সেদিন ভূষণ জলে ভিজে একটা রিক্‌শা ডেকে নিয়ে এসেছিল। আর কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল ঠাকুমার বাপের দেশের মানুষ ভূষণ। কেবল তাই নয়, ঠাকুমার বাবার কি রকম যেন ভাই হয় ভূষণের বাবা। কাজেই ভূষণ হয়ে গেল ঠাকুমার জ্যাঠতুতো ভাই। কেননা ভূষণের বাবা ঠাকুমার বাবার চেয়ে বয়সে বড় ছিল। বাস-এ বসে বসে এসব আলাপ। তারা পদ্মপুকুর নেমে পড়ল আর ভূষণ চলে গেল শ্যামবাজার। শ্যামবাজার হারুঠাকুর লেনে তার সোনার দোকান এবং বাসা।

হারুঠাকুর লেনে ভূষণ পোদ্দারের বাসায় সুদামকে পরদিনই যেতে হয়েছিল ঠাকুমাকে নিয়ে। অর্থাৎ আত্মীয়তার রসটাকে আর একটু গাঢ় করে পাক দিয়ে এল বুড়ী। ভূষণের বৌ নেই। টি-বি হয়ে মারা গেছে চার বছর আগে। ঘরে টগরের বয়সের একটি মেয়ে শুধু। আর ছেলেপুলে হয়নি ভূষণের। তার ছুদিন পর সুদামকে আবার যেতে হয়েছিল ভূষণের বাসায় শোভাকে আনতে। বুড়ী বায়না ধরেছিল ভূষণের মেয়েকে দিন ছুই এবাড়ি এনে রাখতে। আহা, মা মরা মেয়ে—একলা থাকে! যদি আর একটা ভাই কি বোনও থাকত। প্রথমবার এসে শোভা ছুদিনের জায়গায় তিন দিন এবাড়ি ছিল। তারপরেও অবশ্য আরো অনেকবার এসেছে। এবেলা থেকে ওবেলা চলে গেছে। কি এসে ঠাকুমার সঙ্গে টগরের সঙ্গে কথা বলে চা খেয়ে ঘণ্টা ছুই পরে শ্যামবাজার ফিরে গেছে। আগে আগে সুদামকে যেতে হত ওকে হারুঠাকুর লেনে পৌঁছে দিতে।

এখনও মাঝে মাঝে শোভা আসে। আগের মতো ঘনঘন আসে না। এখন অবশ্য একলাই ও বাসায় ফিরে যায়। ইচ্ছা করে সুদাম সঙ্গে যায় না এবং শোভাও বলে না। ঠাকুমা অবশ্য প্যান-প্যান করে। কিন্তু শোভা বা সুদাম ঠাকুমার প্যানপ্যানানি গায়ে মাখে না।

সঙ্গে যায় না—কারণ সঙ্গে যাবার আর দরকার পড়ে না। মনের দিক থেকে তারা দুজন এত বেশি একজন আর একজনের কাছে এসে গেছে যে শ্যামবাজার থেকে ওকে নিয়ে আসতে বা শ্যামবাজার পৌঁছে দেবার অছিলায় সুদামের ছুটোছুটি করার পালা এক বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। টগর ব্যাপারটা বুঝে গেছে। তাই ঠাকুমা যখন শোভাকে আনতে কি বাসায় পৌঁছে দিতে সুদামকে ডাকে সুদাম নানারকম ওজর আপত্তি তোলে। শরীর ভাল না, চাঁদা তুলতে বেরোতে হবে এধরনের আর একটি কাজের কথা বলে সরে থাকতে চেষ্টা করে। সুদামের হাবভাব দেখে এবং যদি শোভা উপস্থিত থাকে তো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে টগর ঠোঁট টিপে কেবল হাসে, কথা বলে না।

তা হলেও, বলতে কি, শোভা যত চালাকচতুর মাথায় যত বুদ্ধি রাখে টগর সেই তুলনায় কিছু না। একটু না, বেশ সরল মেয়েটা। এই জন্যই টগরের জন্য সুদামের মাঝে মাঝে ভয়ানক দুশ্চিন্তা হয়। সাদা মন সরল বুদ্ধি নিয়ে মেয়েরা যত সহজে ফাঁদে পড়ে চালাক-চতুর মেয়েদের দিয়ে সে রকম আশঙ্কা কম। তা না হলে টগরের মুখখানা শোভার মুখের চেয়ে সুন্দর। লম্বা ছাঁদের শরীর। শোভা বেঁটে, তবে রংটা খুব ফরসা। যেন ফরসা রঙের জন্য মনে হয় ওর শরীরটাও নরম তুলতুলে। লম্বা গড়ন এবং শ্যামলা রং বলে টগরকে দেখলে মনে হয় ওর শরীরটা বুঝি শক্ত কাঠকাঠ। আসলে অবশ্য তা না। টগরের হাত পা আঙুলও বেশ নরম। এখন অবশ্য সুদাম ও টগরের মধ্যে তেমন ঝগড়াঝাঁটি হয় না। বছর দুই আগেও দুই ভাই

বোনে মারামারি ধস্তাধস্তি কম করেনি। আর মারতে গিয়ে সুদাম দেখত টগরের হাত গলা পিঠ কোমর কত নরম কচি।

হ্যাঁ, ভূষণ পোদ্দারের মেয়ে শোভা মাঝে মাঝে এবাড়ি আসে। আর ভূষণ আসে রোজ। স্নো পাউডার মেখে এণ্ডির পাঞ্জাবি চড়িয়ে দু হাতের আঙুলে চারটে আংটি পরে জামাইবাবুটি সেজে ভূষণ রোজ রাত নটার পর একবার এসে উঁকি দেবেই।

'দিদি কেমন আছেন?' ভূষণ প্রথম বুড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। বুড়ী ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। বুড়ো হলে মানুষের ঘুম কত কমে যায় ঠাকুমাকে দিয়ে সুদাম বেশ টের পাচ্ছে।

কিন্তু শুয়ে পড়লে হবে কি। কেবল এপাশ আর ওপাশ। আর থেকে থেকে সেই সন্ধ্যা থেকে এক রব। ভূষণ কেন এল না আজ এখনো—ভূষণ আজ অত রাত করেছে কেন।

ঘরের মেঝেয় হ্যারিকেন জ্বেলে টগর কাগজের ফুল তৈরি করে। বুড়ীর কথা টগরের কানে যায়। কিন্তু কথা বলে না ও, নিজের মনে কাঁচি কাগজ আঠা সুতো নিয়ে কাজ করে। কেননা একবার যদি টগর মুখ খোলে তো বুড়ী—'ভূষণ আজ এখনো এল না' থেকে আরম্ভ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হেন কথা নেই যে নতুন করে আরম্ভ করবে না। রোজই কথাগুলি বলছে বটে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বিছানায় শুয়ে পড়লে আবার সব কটি কথা নতুন হয়ে অভিনব হয়ে বুড়ীর মগজে এসে ভিড় করে আর একটু ছিদ্র পেলে ফরফর করে সেগুলি বেরোতে আরম্ভ করে। 'বাড়িআলা ভাড়া বাড়াতে চাইছে—মিনসের আক্কেল আছে! বারো বছর ভাড়া গুনে আসছি—আর তুই নতুন করে আজ একটা বছর ধরে ভাড়া বাড়াও গীত গাইতে শুরু করেছিস—ছাদ দিয়ে জল পড়ে—দু দুটো ঘরের মেঝের সিমেণ্ট ফেটেফুটে হাজারটা সাপের গর্ত ব্যাঙের গর্ত তৈরী হয়েছে। হাঁটা যায় না, বসা যায় না, খোয়ার ঘষায় পায়ের চামড়া, পাছার চামড়া ছড়ে গিয়ে ঘা হবার অবস্থা আর তুই কিনা—হুঁ গায়ের গরম, আমি বাড়িআলা, যা খুশি করব—কি

করবি কর না তুই—একটা নয়া পয়সা ভাড়া বাড়ানো হবে না—তুলে দিবি—দে না তুলে, দেখি তোর কত বড় হিম্মত—আইন আছে না—বারো বছর ভাড়া গুনে আসছি—তবে আর রেণ্ট কণ্ট্রোল অফিস বসিয়েছে কেন গভর্ণমেণ্ট—?'

'আহা তুমি কি আরম্ভ করলে ঠাকুমা—?' হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠে এক সময় টগর কথাটা বলে ফেলে। বাস্ আর যায় কোথায়। বুড়ী হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করে দেয়। আর কান্নার সঙ্গে প্রলাপ, 'আজ যদি আমার কার্তিক বেঁচে থাকত তো মুখপোড়া মিনসে ছোটলোক গায়েনের বেটা আমায় এমন করে অপমান করে যায়—বাড়ি থেকে তুলে দেব—কার্তিক তোর টুঁটি চেপে ধরত না! মুখ থেকে জিভ খসিয়ে ছাড়ত না!' কথা শেষ করে বুড়ী কার্তিকের জন্য কাঁদতে আরম্ভ করে।

সুদাম টগরের বাবা কার্তিক দত্ত চার বছর আগে লরির ধাক্কা লেগে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে মারা গেছে। একান্ন বছর বয়স হয়েছিল মানুষটার। কাজ সেরে রাত্রে ফিরছিল। অসময়ে মরে গিয়ে সুদামদের পথে বসিয়ে গেছে। কটা টাকা আর ব্যাঙ্কে রেখে গিয়েছে।

বুড়ী রাতদিন সেই বিলাপ করে।

'আমি তো বসে আছি, কাজ সেরে কেতো বাজার নিয়ে ঘরে ফিরবে—পথের দিকে তাকাই—বুকের ভেতরটা কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করে ওঠে—অত রাত তো ছেলে আমার কোনদিন করে না—হুঁ, দশটা বেজে যায়—এদিকে উনুনের কয়লা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—কলের জল পড়া বন্ধ হল—একবার ঘরে যাই একবার সদরে দাঁড়াই—আর তখন মুখপোড়া গায়েনের বেটাই তো ছুটে এসে খপর দিয়ে গেল—কার্তিক হাসপাতালে আছে—চৈতন্য নেই—ও আমার কেতো রে— আমার ঘাড়ে কতবড় বোঝা তুলে দিয়ে তুই পালিয়ে

গেলিরে—ও বাপ রে, আমি যে এখন চোখে মুখে পথ দেখছি না রে বাপ—'

ইস্! টগরের ইচ্ছা করে বুড়ীর মুখে বাটনা বাটার শিলটা তুলে দেয়। 'ঠাকুমা তুমি কি একটু ঘুমোতে পার না···বকে বকে কি তোমার মুখে ব্যথা ধরে না—দিন নেই রাত নেই, তুমি যদি কেবল চেঁচাতে থাক তো আমার পালিয়ে যেতে হবে—চব্বিশঘণ্টা একরকম কথা শুনতে কারো ভাল লাগে!' যেন টগরের গলাও ধরে যায়, চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে।

বুড়ী তখন একটু চুপ করে। কিন্তু কতক্ষণ? টগর কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে, অবশ্য আগের মতন আর কান্নাকাটি না, লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলে চাপা গলায় বুড়ী বিড় বিড় করতে আরম্ভ করে। টগর কিছু শুনতে পায় কিছু শুনতে পায় না। 'তবু যদি বাপ তোর বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে যেতো—আর ওই তো কটা টাকা—কদিন আর······বলে কিনা পুঁজি ভেঙ্গে খেলে সাত রাজার ধনও ফুরোয়······হেঁ, ছেলে হয়েছে······আড্ডা মেরে রকবাজি করে সময় পায় না—ও আনবে পয়সা ঘরে—ও করবে রোজগার—বোনকে বিয়ে দেবে—হা রে কেতো, কেমন এক ছেলের জন্ম দিয়ে গেছিস একবারটি তুই দেখে যা, কী চরিত্তের ছেলে—'

'এই বুড়ী!' টগর চমকে উঠল, বুড়ীর কথা থেমে গেল। দরজায় সুদাম এসে দাঁড়িয়েছে। এমন অনেকদিন হয়েছে। সংসারের অন্য সব কথা শেষ করে কান্নাকাটা থামিয়ে ঠাকুমা যখন সুদামের বাইরে বাইরে আড্ডা দেওয়া রকবাজি করা আর তার চরিত্র নিয়ে সমালোচনা শুরু করেছে তখন কোথা থেকে ধূমকেতুর মতো সুদাম এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। বুড়ীর কথা কয়টা সে শুনে ফেলেছে। 'রোজ আমার চরিত্তির নিয়ে খোঁটা—হুঁ আমি কি মদ খাই না মেয়েমানুষ নিয়ে আছি, বড় যে রাতদিন আমার পেছনে লেগে থাকা হচ্ছে—আমি তোমার মুখ থেঁতো করে দেব একদিন বলে রাখছি—

জিভ কেটে দেব—ঘাটের মড়া—ছেলে চিবিয়ে খেয়েছে—ছেলের বৌকে চিবিয়ে খেয়েছে—এখন আর কাজ নেই—এখন কেবল আমার—'

'ইস্ তুই থাম না দাদা!' টগর ভয়ংকর অস্বস্তি বোধ করে। কেননা ঠাকুমা আর সুদাম যদি ঝগড়া করতে আরম্ভ করে তো পাড়ার লোক জড়ো হবে। কতদিন এমন হয়েছে। বুড়ী এখনি হাউ মাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করবে আর সুদাম হৈ রৈ করে বাড়ি মাথায় তুলবে। টগর দুজনের একজনকেও বলে কয়ে হাত ধরে মিনতি করে থামাতে পারবে না। 'আমি কি তোরটা খাচ্ছি বড় যে কেবল আমার ছিদ্র তলাশ করে বেড়ানো! টগরকে বিয়ে দিতে হবে সে আমি দেখব—বাবার টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে—আমি দেখব—তুই কে, রাতদিন কেবল বক্ বক্ বক্—মড়া মরবেও না।'

মরার কথা তুললেই বুড়ী হাউ মাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে। মরণকে যে ঠাকুমার কত ভয় টগর জানে। 'এই দাদা—আঃ কী আরম্ভ করলি তুই—এখনি—'

টগরের কথা শেষ না হতে ভূষণ এসে যায়।

'দিদি কেমন আছেন?' ভূষণের গলার স্বর শোনামাত্র বুড়ী কান্না থামিয়ে দেয়। আর সুদামও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। আজও তাই হল। ঝগড়াটা ভাল করে জমতে আরম্ভ করার আগেই ভূষণ পোদ্দার এসে গেল। নয়নতারার ভাল লাগল। হয়তো টগরও স্বস্তিবোধ করল। কিন্তু সুদাম? চুপ করল বটে, সেখান থেকে সরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে বিড়বিড় করে বকতে আরম্ভ করল। 'স্কাউণ্ড্রেলটা এসে গেছে, আসবেই—না এসে থাকতে পারে না শূয়ার—আমি জানি। রোজ এ বাড়ি না এলে তার পেটের ভাত হজম হয় না, চোখে ঘুম আসে না।'

সুদাম আয়নায় নিজের মুখ দেখে। ঘৃণায় নিমেষে তার মুখের চামড়া কুঁচকে উঠেছে। চেহারাটা বিশ্রী হয়ে আছে সে বেশ দেখতে

পায় এবং কেন এমন হয় তাও চিন্তা করে। অথচ ঠাকুমার সঙ্গে ঝগড়া করার সময় তার মুখ চোখের অবস্থা কোনদিন এমন খারাপ হয় না। অনেক সময় নিজের ঘরে থেকে সে বুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে, ঝগড়া করতে করতে আরশি দিয়ে মুখ দেখে চিরুনি চালিয়ে মাথার চুল ঠিক করে বা ঝগড়া করতে করতে দাড়ি কামায়। অর্থাৎ কাজ-কর্ম যা করার স্বাভাবিকভাবে তা করে যায় এবং চেহারাটাও স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু ভূষণ পোদ্দার এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সুদামের মাথার ভিতরটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। চোখ মুখের অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

আজও তাই হল।

এবং যখন এমন হয় তখন সে পায়চারি করতে শুরু করে দেয়। তার হাতের মুঠো তু'টো শক্ত হয়ে ওঠে। একবার বিছানার কাছে, একবার টেবিলের কাছে, একবার জানালার কাছে চুপ করে সে দাঁড়ায়, তারপর হাঁটতে আরম্ভ করে।

'আহা! এ হল গিয়ে তোমার কনকচাঁপার ছাঁট—'

'আমি যে ভুঁইচাঁপা তৈরি করতে চাইছি।'

'হুঁ তার ছাঁট আলাদা। কাগজ ভাঁজ করতে হবে এভাবে।' মেঝের ওপর টগরের পাশে আসন পেড়ে বসে কাগজ ভাঁজ করতে লেগে যায় ভূষণ। 'দাও, আমায় দাও কাঁচিখানা।'

তারপর টগরের কাঁচি তুলে নিয়ে ভূষণ ভয়ানক মনোযোগের সঙ্গে ভাঁজ করা কাগজ কাটতে আরম্ভ করে। আস্তে আস্তে কাগজের ভাঁজ ধরে ধরে কাঁচি ঘোরায়। সঙ্গে সঙ্গে ভূষণের হাত ঘোরে চোখ ঘোরে যেন মাথাও একটু একটু ঘোরে। শরীরটাও ঈষৎ নড়তে চড়তে থাকে।

ছাঁটা কাগজের কুচিগুলি ঝুর ঝুর করে কিছু ভূষণের কোলের ওপর কিছু টগরের কোলের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

ভুঁইচাঁপার জন্য কেমন করে কাগজ কাটতে হয় ভূষণ তাই দেখাতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তার শরীরটা মাথাটা টগরের কোলের কাছে কপালের কাছে সরে যায়।

কাগজ কাটা শেষ হতে ভূষণ কাঁচিটা মেঝের ওপর রাখে। ঝনাৎ করে একটা শব্দ হয়। ঘরে আর কোন শব্দ নেই তখন। না, আর একটা শব্দ হচ্ছে। বুড়ীর নাক ডাকছে।

ঘরের ওপাশটা অন্ধকার। যেখানে বুড়ীর তক্তাপোশ।

অন্ধকারে বুড়ীর নাক এখন ভুস ভুস করে শব্দ করতে শুরু করেছে। এতক্ষণ ভূষণের সঙ্গে জেগে থেকে বুড়ী সুখদুঃখের কত কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেও যেন বুড়ী চুপ করে নেই। নাকের শব্দ করছে। বুড়ী ঘুমিয়ে পড়তে ভূষণ টুক করে উঠে এসেছে আলোর কাছে টগরের পাশে। কাঁচির কাজ শেষ করে কাগজের ভাঁজ খুলে ফেলল ভূষণ। সবটা কাগজ টগরের মুখের সামনে মেলে ধরল। এক একটা ভাঁজে যোলটা করে পাপড়ি।

আটটা ভাঁজের পাপড়ি যোগ করলে কত হয়?

এতগুলি ভুঁইচাঁপার পাপড়ি একসঙ্গে কাটা হয়ে গেল দেখে টগরের দু চোখ বড় হয়ে গেছে। ভুরু বেঁকে গেছে। টিকলো নাকটা অল্প একটু তুলে ধরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে সরু সুছাঁদ পাপড়িগুলি দেখছে।

মুখে প্রশংসা করছে না ও। কিন্তু চোখ দুটো থেকে প্রশংসা ঝরে পড়ছে। চমৎকার হাত ভূষণের।

—হবে না! ভূষণ হি হি করে হাসছে। অল্প শব্দ করে হাসছে। যেন জোরে হাসতে ভয় পাচ্ছে, পাছে নয়নতারা জেগে ওঠে। জেগে উঠলে আবার ভূষণকে উঠে গিয়ে অন্ধকারে তক্তাপোশের পাশে

বেতের মোড়াটায় বসতে হবে। আর বুড়ার হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কিন্তু ভূষণ যেন এত কথা বলতে পছন্দ করে না। করে না সত্যি। তাই বুঝি বুড়ীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাজার বার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে আলোর জায়গাটা দেখছিল। পা দুটো মুড়ে পিঠ বেঁকিয়ে মাথা গুঁজে কাগজ কাঁচি আঠার বাটি ছড়িয়ে টগর যেখানে বসে ফুল তৈরি করছিল। যেন ঐ আলো ঐ ফুল ভূষণকে টানছিল।

'হবে না!' ভূষণ পোদ্দারের কালো পুরু ঠোঁট বিস্ফারিত হল। কাঁচা পাকা চুল ভরতি মাথাটা উত্তেজনায় দুলে উঠল। 'দশ বছর বয়স থেকে গহনার নক্‌শা করতে শিখেছিলাম। তখনকার গহনা আর এখনকার গহনা আরে রাম! এখন তো প্লেনের ওপর কাজ চাইছে মেয়েরা। এখন আবার নক্‌শা-টক্‌শার কাজ আছে নাকি। সব কেমন জলো হয়ে গেছে। মেয়েরা জলো হয়ে গেছে। তাদের পছন্দ শখ আহ্লাদও আজকাল ফিকে কেমন জলো হয়ে গেছে। এখন গহনাই বা পরছে কটা মেয়েছেলে শুনি? এক হাতে তারের মতো সরু একটা বালা আর এক হাতে ঘড়ি। বাস্ হয়ে গেল অলঙ্কার পরা। গলায়ও কিছু নেই, কানেও এক রতি সোনা চোখে পড়ে না।'

তারপর ভূষণ বলছিল স্লেটের ওপর পেন্সিল বুলিয়ে বুলিয়ে ছোট ছেলেরা যেমন 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' লিখতে শিখে তেমি ভূষণকে সারা দুপুর বৌবাজারের নবীন পোদ্দারের সোনার দোকানের এক কোনায় বসে ফুল পাতা পাখি মাছ ও মকরমুখ আঁকা শিখতে হয়েছিল। আগে তো নক্‌শা। নক্‌শার হাত পাকা না হলে গহনা গড়বে কোন স্যাকরা।

'চুড়ি বালা মাকড়ি হার বাজুবন্ধ অনন্ত টায়রা মানতাসা তখন অলঙ্কারই বা ছিল কত পদের—আর এক একটা জিনিসের ওপর কত সূক্ষ্ম সুষম কাজ করতে হত।' ভূষণ টগরকে হাত নেড়ে

বোঝায়। 'গহনা তো তাকেই বলে, অলঙ্কার বলতে তাই বোঝায়। সোনার ওপর বিচিত্র কারুকার্য থাকবে। আর যে-স্যাক্‌রার হাতের কাজ যত সুষম তার তত কদর—হুঁ ছিল—এককালে, আজ নেই। আজ তেমন করে একটা মকরমুখ বালা তৈরি করে দিক না—একটা সূর্যমুখী লকেট করে দিক তো কোন স্যাক্‌রা—পারবে না—তেমন নক্‌শাই আর তাদের হাতে আসে না, সোনার কাজ ভুলে গেছে স্যাক্‌রারা—ছেলে ছোকরা যারা নতুন কাজ শিখছে তাদের কথা ছেড়েই দিলাম—তারা নক্‌শা কাকে বলে তাই জানে না।'

টগর চুপ করে শুনছিল।

বুড়ীর নাক ডাকছিল।

নিশ্বাস বন্ধ করে সুদাম দরজার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভূষণের বক্তৃতা শুনছিল।

কেবল কথা আর কথা। টগরের সঙ্গে এত কথা বলতে ভালবাসে পাজীটা। আজে-বাজে কত কি বকছে।

'কারিগর মানে শিল্পী। সোনার ওপর পাখি ফুল লতা পাতার নমুনা তুলে তুলে এই হাত পাকিয়েছি। সেই ছোটবেলা থেকে —হুঁ, দশবছর বয়স থেকে—এখন তোমার কনকচাঁপা ভুঁইচাঁপা ফুলের ছাঁট যদি আমি কেটে না দিতে পারলাম তো এই হাত দুটো রেখেছি কেন তুমিই বলো—হি-হি।'

টগর হাসছে। টগর হাসছে না? টগরের গালে টোল পড়তে দেখে সুদামের মাথার ভিতর যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। ঐ লোকটাকে—ঐ বুড়োধাড়ি ভূষণকে কি টগরের ঘেন্না ধরে না? রোজ অসভ্যটা এসে গল্প করছে, কনকচাঁপা আর ভুঁই-চাঁপার পাপড়ি কেমন করে কাঁচি দিয়ে কাটতে হয় শেখাবার অছিলায় টগরের গা ঘেঁষে বসছে। আর টগর হাঁ করে জানোয়ার-টার কথা গিলছে, হাসছে।

দরজার আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুদাম ঘামছিল। একটা

এরূপ ইচ্ছা নিয়ে ভূষণ পোদ্দার এ বাড়ি আসছে, ঘন ঘন আসছে। ভূষণকে যদি বাধা দিতে হয় তো সুদামই দেবে। চোখের ওপর সে দেখছে। ভূষণ কোন্‌দিকে হাত বাড়াতে চাইছে। ভূষণের চোখে কোন্‌ ইচ্ছা নাচানাচি করছে তা বুঝতে সুদামের বাকী নেই। ঠাকুমা বুড়ী এসব বুঝবে না।

ভূষণের নাম শুনলেই বুড়ী চিনির মতন গলে যায়। ভূষণের দোষ ত্রুটি কখনও দেখবে না। তা ছাড়া চোখে ছানি পড়তে শুরু করেছে। কোন্‌টা সাদা কোন্‌টা কালো তাই এখন নয়নতারার চিনতে কষ্ট হচ্ছে।

চিন্তা করতে করতে সুদাম এক সময় নিশ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। শুয়ারটা টগরের হাত ধরল না? কাঁচিটা নিতে গিয়ে টগরের হাতে চাপ দিল না? এই স্টুপিট—যেন চিৎকার করে উঠেছিল সুদাম—কিন্তু তার গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না। অতি কষ্টে একটা শুকনো ঢোক গিলে সে টলতে টলতে দরজার অন্ধকার আড়াল ছেড়ে নিজের ঘরের দিকে চলল।

'যার মন সুন্দর অন্তর সুন্দর, তার দৃষ্টিও সুন্দর—সুন্দর দৃষ্টি নিয়ে সে সারাক্ষণ সুন্দর জিনিস দেখবে। জাত শিল্পীর মনটাও সুন্দর—তাই সারাক্ষণ সে সুন্দর জিনিস দেখে, সুন্দর ছবি আঁকে, চমৎকার ফুল তৈরি করে, মিষ্টি মিষ্টি গান রচনা করে, সুন্দর কবিতা লেখে—বুঝেছ—তুমিও পারবে, যদি মনটা সেভাবে তৈরি কর আস্তে আস্তে তোমার চোখও সুন্দর হবে--তখন তোমার হাতের কাঁচি আপনা থেকেই চাঁপা ফুল, গোলাপ ফুল, মালতী ফুলের পাপড়ি কেটে চলবে, হুঁ অবিকল মালতীর পাপড়ি।'

সুন্দর বোঝাচ্ছে, সুন্দর ব্যাখ্যা করছে স্কাউণ্ড্রেলটা এক ফোঁটা মেয়ের কাছে। সুদামের কিছু বুঝতে বাকী নেই। পঞ্চাশ বছরের বুড়ো ষোল বছরের মেয়ের মন নরম করে আনছে। তাই এত কথার ফুলঝুরি, তাই রোজ এত সাজগোজ করে এ বাড়ি আনাগোনা। দাঁড়াও।

'তুই ভাত খাবি না দাদা ?'

'না।'

'কি হয়েছে ? সুদামের বিছানার কাছে চলে এল টগর। সুদাম উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। টগর দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে পরে ভিতরে ঢুকল।

'কেন, তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে ?'

'না।'

'তবে ভাত না খাওয়ার হল কি ?

'আমার ইচ্ছা করছে না—তুই এখান থেকে যা।'

টগর অল্প হাসল।

'কেন, হঠাৎ আবার রাগ করলি ? বুড়ীর সঙ্গে তো রোজই ঝগড়া লেগে আছে—তাতে রাগ করে ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিবি ?

'আমি রাগ করিনি।' সুদাম উঠে বসল। হাত দিয়ে কপালের চুল পিছনে ঠেলে দিল। তার গলার স্বর ভয়ানক গম্ভীর। বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। আগে ছিল। এখন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। বুড়ীর ঘরে টগর শোয়। এই ছোট ঘরটা সুদামের। একটা কেরোসিনের ডিবে জেলে সুদাম কাজ সারে। দরকার হলে টগরদের হারিকেনটা আনে। বাড়িতে একটাই হারিকেন। টগর এতক্ষণ ফুল তৈরি করছিল বলে হারিকেনটা ওঘরেই জলছিল। এঘরটা অন্ধকার। ডিবেটা নেবানো। হয়তো তেল ফুরিয়ে গেছে। তাই আলো নিবে গেছে। অন্ধকার ঘরে সুদাম শুয়ে ছিল। সুদাম যখন উঠে বসল টগর দাদার মুখ চোখ দেখতে পেল না। দেখতে পেলে ওর ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যেত। কিন্তু তা হলেও গম্ভীর স্বরটা টগরের কানে কেমন অদ্ভুত লাগল।

'তবে কি হয়েছে তোর শুনি?' টগর বিছানার ওপর ঝুঁকে ছিল। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'আমার মন ভাল না।'

'ও বুঝেছি।' টগর হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। নিশ্চয় শোভার সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে। হওয়া স্বাভাবিক। ভূষণ পোদ্দারের মেয়ে শোভার সঙ্গে সুদামের মাখামাখি টগরের অজানা নেই। সাদা কথায় ওরা দুটিতে খুব প্রেম করছে। যেখানে প্রেম সেখানে মান অভিমান থাকবেই।

'ভূষণ চলে গেছে?' সুদাম হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, কেন, তোর কিছু দরকার ছিল?'

'স্কাউণ্ড্রেল।' সুদাম বিড়বিড় করে উঠল।

নিশ্চয় ভূষণ ওদের ভালবাসার কথা জেনে ফেলেছে। কে জানে, হয়তো ওবাড়িতে সুদামকে যেতে নিষেধ করেছে ভূষণ বা—টগর ভাবল, শোভাকে হয়ত এবাড়ি আর আসতে দিতে চাইছে না। অনেক কিছু হতে পারে। তাই দাদা লোকটার ওপর চটে আছে।

'তোর সঙ্গে এত কি কথা রোজ রোজ বলে সে শুনি?' রুক্ষ গলায় সুদাম প্রশ্ন করল।

টগর চমকে উঠল। ভয় পেল।

'না তো—আমার সঙ্গে খুব বেশি কথা আবার বলল কবে! রোজ তো ঠাকুরমার সঙ্গে বসে গল্প করে।'

'কেন আমার কি চোখ নেই? তোর পাশে বসে পোদ্দার এতক্ষণ কথা বলে গেল না?'

''ও, হ্যাঁ, ওই তো একটা ফুলের ডিজাইন কেটে দেখাচ্ছিল—ওর হাত খুব ভাল।'

'তবে আর না বলিস কেন।' সুদাম ভেংচি কাটল। টগর চুপ করে রইল। আবছা অন্ধকারে টগরকে একটা মাটির পুতুলের মত দেখাচ্ছিল। স্থির কঠিন।

'তুই নিজে যেমন পারিস করবি—ওটাকে ডাকবি না ফুল-টুল তৈরি করা শেখাতে। আমি সাবধান করে দিচ্ছি।' সুদাম আবার শুয়ে পড়ল। 'আমার ভাত এনে ঢেকে রাখ। আমি যখন ইচ্ছা খাব।'

'আমার বয়ে গেছে এখানে রাজ্য টেনে আনতে। ইচ্ছা হলে উঠে খেয়ে যাবে না হলে না খাবে।'

'কি!' স্প্রীং-এর মতো লাফিয়ে উঠে বসল সুদাম। 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। দাঁড়াও তোমায় আমি এমন শিক্ষা দিচ্ছি!'

টগর ছুটে বেরিয়ে গেল। ধাক্কা লেগে দরজার পাল্লাটা খট্ করে শব্দ করে উঠল।

হারু ঠাকুর লেনের ভূষণ পোদ্দারের বাড়ির তুপুরের চিত্রটি বড় সুন্দর। এটা ভূষণদের পৈতৃক ভিটা। ভূষণের ঠাকুর্দা এই বাড়ি তৈরি করে যায়। তখন ছিল একতলা। তখন হারু ঠাকুর লেনে বাড়ির সংখ্যা কম ছিল। গলির একদিকটা রীতিমত ফাঁকা ছিল। তুটো চারটে করে আম কাঁঠাল নারিকেল গাছ প্রায় সব কটা বাড়ির সামনে পিছনে দেখা যেত। আজ আর সেই দিন নেই। আজ বাড়ির সঙ্গে বাড়ি, বাড়ির পিছনে বাড়ির ঠাসবুনন। ভূষণের বাবা একতলাকে দোতলা করে দিয়েছিল। ছেলেরা আবার কোনোদিন একটা তলা তুলবে। যেন সেই আশা করে দোতলার ছাদের ধারগুলোতে লোহার রড পুঁতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ভূষণদের আমলে বাড়ি আর বাড়ানো সম্ভব হয়নি। ভূষণরা তিন ভাই ছিল। ভূষণের বড় ভাই সন্ন্যাসী হয়ে অনেকদিন আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। সেই প্রথম যৌবনে। বিয়ে থা করার আগেই। ভূষণ মেজো ছেলে। ছোট ভাই তুলাল পোদ্দার কিন্তু বাপ ঠাকুর্দারা যা করে গেছে অর্থাৎ ভূষণের মতো সোনার দোকানে ছোটবেলায় কাজ শিখে পরে নিজে দোকান খুলতে পারেনি। ইস্কুলে পড়তে পড়তে ভূষণের ছোট ভাই একদিন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে ফেলল। কলেজে ঢুকল। সেখানেও সব কটা পরীক্ষা পাস করে বেরিয়ে এসে অধ্যাপক হল। অর্থাৎ মস্ত পণ্ডিত হয়ে গেল তুলাল। এটা ভূষণদের বংশের ব্যতিক্রম। তুলাল পোদ্দার পণ্ডিত হয়ে এক ব্যারিস্টারের মেয়েকে বিয়ে করে বসল। কলেজে তুলালের সঙ্গে মেয়েটি পড়ত। প্রেম করে বিয়ে। তুলাল বিয়ের পর আর এবাড়ি আসেনি। আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে বৌকে নিয়ে বালিগঞ্জে আছে।

বৌও বিদুষী। কোন একটা মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকা হয়েছে। কাজেই ভূষণ এতবড় পৈতৃক বাড়ি এখন একলাই ভোগ করছে। ওপরে তিনটে ঘর। নীচে তিনটে। তিন ভাইয়ের জন্ম দোতলায় তিনখানা ঘর করে রেখেছিল ভূষণের বাবা। নিচের ঘরগুলি কোন সময় ভাড়া দেওয়া চলবে ভূষণের বাবা মাঝে মাঝে বলত। ভূষণের বাবার আমলে অবশ্য কোন ভাড়াটে ছিল না। ভূষণ একতলার পিছনের দুখানা ঘর ভাড়া দিয়েছে। রাস্তার সঙ্গের ঘরটা তার সোনার দোকান। উকিল ব্রজবিহারী বাবু নিচের দুখানা ঘরে আছেন। তাও অনেকদিন হয়ে গেল। ভদ্রলোক বুড়ো হয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে অসিত ও অমল। অসিত ইদানীং রাইটার্স বিল্ডিংএ চাকরি পেয়েছে। বিয়ে করেছে। অমল কলেজে পড়ছে। ব্রজবিহারীবাবু এখন আর কোর্টে বেরোন না। বাড়িতে বসা। বাড়িতে থেকে কি জানি সাহিত্যের বইটই লেখেন। স্ত্রী হেমাঙ্গিনী অসুস্থ। তিনি একরকম বিছানায় শোয়া। রংটা দিন দিন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। রক্তহীনতায় ভুগছেন পরিষ্কার বোঝা যায়। আসল অসুখটা কি বাইরের লোক ঠিক জানে না।

অসিতের বৌ সুন্দরী। আশ্চর্য, অসিত এত লেখাপড়া জানা ছেলে। একটা গ্রাজুয়েট। স্ত্রী বিমলা কিন্তু সেই তুলনায় কিছুই না। বাবা বড়লোক। বেশ কিছু সোনাদানা ও মোটা পণ নিয়ে ব্রজবিহারী বড়লোকের মেয়ে বিমলাকে পুত্রবধূ করে ঘরে এনেছেন। উকিল ব্রজবিহারী রক্ষণশীল মানুষ। ঘরের বৌ বাইরে গিয়ে কোনোদিন চাকরি করবে না। সুতরাং খুব বেশি একটা লেখাপড়া জানা মেয়ে তাঁর দরকার নেই। বিমলা মেয়েটি বাংলায় চিঠিপত্র লিখতে পারে। বাংলা গল্প উপন্যাসটা পড়তে পারে। এই যথেষ্ট। ব্রজবিহারীর মতে মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরের বৌয়ের অল্প বিদ্যাই ভাল। এখানে বিমলার স্বামী অসিতের 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলার ছিল না। বাবা যেমনটি পছন্দ করেন, যা ভালবাসেন তাই

ত্যার মেনে নিতে হয়েছে। ছোটবেলা থেকে বাবার কাছে এমন শিক্ষাই পেয়েছে সে। অসিত অমল দুজনই। বাবার কোন কথা বা ইচ্ছা অমান্য করার সাহস তাদের নেই। তা বিমলা এবাড়িতে সুখেই আছে। কম লেখাপড়া জানে বলে স্বামী দেওর বা শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছ থেকে অনাদর উপেক্ষা তাকে কখনও ভোগ করতে হয় না।

ভাড়াটেদের এই বৌটির সঙ্গে শোভার খুব ভাব। বয়সেও দুজন প্রায় সমান।

দুপুরে ওপরটা ভয়ংকর নির্জন থাকে। গোটা বাড়িটাই কেমন ঝিমিয়ে থাকে। নিচে দোকানে বসে ভূষণ কর্মচারীদের সঙ্গে সোনার গয়না তৈরি করে। ঠুকঠাক টুকটাক শব্দ হয়। ব্রজবিহারী নিজের ঘরে বসে একমনে সাহিত্যের বই লিখে চলেন। হেমাঙ্গিনী ঘুমোয়। অসিত অফিসে, অমল কলেজে। বিমলা পা টিপে টিপে সোজা উপরে চলে আসে।

ওপরের তিনখানা ঘরের একখানা তালাবন্ধ থাকে। বাকি দুটো ভূষণ ব্যবহার করে। ঘর দুখানা গুছিয়ে সাজিয়ে রাখতে শোভা রাত দিন খাটছে। সারাক্ষণ এটা ঝাড়ছে ওটা মুছছে। বোঝা যায় ঘর দোর ও ঘরের জিনিসপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে রাখা শোভার একটা নেশা। সকলের এই নেশা থাকে না। বিমলার নেই। যেটা না করলে না হয়, যেটুকু দরকার সেটুকু ছাড়া বাড়তি খাটুনি তার পোষায় না। সারাক্ষণই শোভার মতন এটা গুছোবে ওটা ঝাড়বে সেটা মেজেঘষে পরিষ্কার করবে নাকি। 'তাতে লাভ!' বিমলা হেসে মাঝে মাঝে শোভাকে বোঝায় : 'কাল আবার ধুলো পড়বে ময়লা আটকাবে—কাজেই আবার সেসব পরিষ্কার করতে হবে ঝাড়তে হবে। বরং দিনকতক যেটি যেমন আছে থাকতে দাও না, সারাক্ষণ যদি তুমি আয়না, টেবিল, তক্তাপোশ, দরজা, জানালার পর্দা, পা-পোশ, ঘটি-বাটি-গেলাস,

পেয়ালা-পিরিচের ভাবনা নিয়ে থাক তো নিজের কথা ভাববে কখন—নিজেকে দেখবে কখন।'

হাঁ করে তাকিয়ে থেকে শোভা প্রথম প্রথম নিচের ভাড়াটেদের সুন্দর বৌটির কথা শুনত, ওকে দেখত। টানা-টানা চোখ। কালো চিকন ভুরু। লাল টুকটুকে ঠোঁট। আর অসম্ভব ফর্সা রং। শোভার গায়ের রংও ফর্সা। কিন্তু বিমলার গাল, গলা, হাত, পা থেকে যেন একটা সোনালী আভা ঠিকরে পড়ে। অতিরিক্ত লাবণ্য থাকলে যা হয়। রং ছাড়াও এমন আর একটা কিছু বিমলার গায়ের চামড়ার মধ্যে মিশে আছে যা কেবল সদ্য-ফোটা ফুলের গায়ে, সকালের টাটকা রৌদ্রের মধ্যে দেখা যায়। বিমলার ঐ রং শোভাকে প্রথম দিকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তারপর অবশ্য চমকের ভাবটা কেটে গেছে। ক্রমাগত দেখার অভ্যাসের ফলে যা হয়।

না, শোভা তখন বুঝত না, নিজেকে দেখা নিজের কথা ভাবা বলতে বিমলা কি বোঝাতে চাইত।

তারপর শোভা বুঝেছে।

নির্জন দুপুরে ছাদের আলিসার ছায়ায় বসে শোভার চুল বেঁধে দিতে দিতে বিমলা আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দিয়েছে। ষোল বছরের একটি বিবাহিতা মেয়ে সমান বয়সের একটি কুমারীকে অনেক কিছু বোঝাতে পারে শেখাতে পারে। শুনতে শুনতে প্রথম প্রথম শোভার কান লাল হয়ে উঠত।

বিমলা তখন আচ্ছা করে ওর গাল টিপে দিত।

'আহা লজ্জা—দুধের বাচ্চা কিনা, শুনতে লজ্জা করছে।'

শোভা তখন ফিক করে হাসত।

তারপর অবশ্য তার লজ্জা কেটে গেছে।

ক্রমাগত দেখার অভ্যাসের ফলে বিমলার গায়ের ঝকমকে রং দেখে যেমন সে অবাক হত না, তেম্নি ক্রমাগত শুনে শুনে অভ্যস্ত হবার পর তার কথাগুলি শুনে কান গালও আর লাল হয়ে উঠত না।

আর ঠিক এমন দিনে সুদাম এসে পড়ল।

বিমলার কাছে পাঠ নিয়ে ততদিনে শোভার মন তৈরী হয়ে গেছে। ছেলেটিকে দেখামাত্র ও সাংঘাতিকভাবে প্রেমে পড়ে গেল।

শোভা নিজেকে ভাল করে দেখতে, নিজের কথা বেশি করে ভাবতে শিখে গিয়েছিল বলে নিজের দিকে তাকিয়ে সুদামের কথাও ভাবত, সুদামকেও দেখত।

সুদাম যদি কোনদিন চুল না আঁচড়িয়েছে দাড়ি না কামিয়েছে, শোভা রাগ করত। পরনের জামাকাপড় ময়লা দেখলে শোভা চটে যেত। হয়তো তার সঙ্গে কথাই বলত না সেদিন। শোভার মন রাখতে সুদাম ফর্সা জামাকাপড় পরতে সর্বদা চুল পাট করে রাখতে ও নিয়মিত মুখ কামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। পরে সে সব অভ্যাস হয়ে গেছে। শোভাকে আর বলে দিতে হত না এর জন্য। রাগ করতে হত না। যখনই এবাড়ি এসেছে সুদাম ফিট বাবুটি সেজে এসেছে।

বিমলা সুদামকে দেখে খুশী হয়েছিল। চমৎকার ছেলে। সুদাম গল্প করে চলে যাবার পর বিমলা শোভার কানে কানে বলত, 'ইস, যদি বিয়ের আগে এই ছেলের দেখা পেতাম আমি কানে মাথায় ওর প্রেমে ডুবে থাকতাম। কী চমৎকার গড়ন। নাকটা কেমন খাড়া। কান দুটো কী সুন্দর—মনে হয় অশথের দুটো কচি পাতা—কানের ডোলটাই অদ্ভুত। পুরুষের এমন কান দেখতে ভাল। তোমার ভাল লাগে না?'

শুনে শোভা চুপ থেকে ঠোঁট টিপে হাসত।

এবং দেখতে দেখতে এমন চমৎকার নাক ও কান-ওয়ালা ছেলের প্রেমে পড়ে গেল।

'উহুঁ—কেবল বুড়ী ঠাকুমাকে নিয়ে বেড়াতে আসা আর যাওয়া, কিছু না। একলা আসে না কেন। তুমি বলবে দুপুরে বাড়ি নিরালা থাকে। টুক করে যেন ওপরে উঠে আসে।'

বিমলার উপদেশ শোভা শুনেছিল। দুদিন পর শোভার সাহস

পেয়ে সুদাম, ভূষণ নিচে দোকান থেকে দেখতে না পায়, পিছনের গলি দিয়ে বাড়িতে ঢুকে দোতলার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে এসেছিল। একদিন দুদিন। তারপর রোজ। তারপর ঠাকুমা দেখতে চেয়েছে অছিলায় শোভাকে নিয়ে সুদাম রাস্তায় বেরিয়েছে। পার্কে গেছে, রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে, সিনেমা দেখেছে। সিনেমা-টিনেমা দেখা-টেখা শেষ করে পরে দুজন বুড়ী নয়নতারার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। শোভাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার অজুহাতে আবার একসঙ্গে দুজনের খানিকটা বেড়ানো, গল্প করা।

ভূষণ জানত না দেখত না।

টুক্‌টাক ঠুক্‌ঠাক শব্দ করে সেই দুপুর থেকে রাত নটা দশটা পর্যন্ত দোকানে বসে গহনা তৈরি করেছে। গহনার ওপর ফুল লতা পাতা কি মকরমুখের নক্‌শা তুলেছে।

'তা তো বুঝলাম।' দেখে শুনে বিমলা আর একদিন বলল, 'সিনেমা দেখা আর রেস্তোরাঁয় খাওয়া কি সব—মেঘে মেঘে যে বেলা হয়ে যাচ্ছে। ও না হয় বেটাছেলে—উড়ে উড়ে চিরকাল মধু খেতে পারবে। কিন্তু তুমি যে মেয়েছেলে—তুমি তো বেশিদিন উড়তে পারবে না ভাই। তোমার পাখা শীগ্‌গির নড়বড়ে হয়ে যাবে, শরীর ভারী হয়ে যাবে। উড়তে গেলে ধপাস করে নিচে পড়ে যাবে। তখন উপায় ?'

রূপসী বিমলার চোখ দুটোর দিকে আবার শোভা ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে সেদিন তাকিয়ে রইল।

'খুকী—কেমন না ?' বিমলা শোভার চিবুক ধরে জোরে নাড়া দিয়েছিল। 'ষোল বছরের যুবতী ন বছরের মেয়ে হয়ে থাকলে এই দশা হয়। কথা গুলে খাওয়ালেও ভেতরে যায় না—মগজে ঢোকে না। বলি, মেয়েদের ফুল ফুটলে তাড়াতাড়ি ফল ধরাতে হয়, না হলে ফুল শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে—এখন বুঝলে ভাই।'

শোভা সবটা এখন একসঙ্গে বুঝতে পেরে বিমলার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে হেসে ফেলেছিল।

'তোমার পেটে এত বৌ। যাঃ, কি সব কথা!'

'আচ্ছা, তবে ঐ ঘুরে ঘুরে রেস্টুরেণ্টে খাও আর সিনেমা ছাখো গে। তারপর একদিন বিমলার কছে বসে কাঁদবে।'

কিন্তু তার পরদিনই শোভা সুদামকে দেখে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

'কি হল, এমন মুখ ভার যে আজ?' সুদাম শোভার হাত ধরেছিল। শোভা হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল।

'কথা বলছ না যে?' সুদাম আর হাত ধরেনি। তার হাসি হাসি মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল।

'এম্নি।' শোভা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

'নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে—' সুদাম বলতে আরম্ভ করছিল। শোভা এবার চোখ বড় করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

'মন ভাল না তাই চুপ করে আছি।'

'কেন, ভাল না কেন।'

'তুমি বুঝবে না।'

'না বললে আর বুঝব কি করে।'

'তোমাকে বললেও কিছু লাভ হবে না।'

'কেন?'

'কেন বুঝবে শুনি?' শোভা লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছিল। 'তুমি কি চাকরি-বাকরি কর? লেখাপড়াও শেষ করে বসে আছ—কাজেই কোনদিন পাসটাস দিয়ে চাকরি পাবে তারও আশা নেই। কারবার-টারবার দেবে তেমন পয়সাও নেই তোমাদের—তোমার ঠাকুমা তো কদিন তোমাদের সংসারের অভাবের কথা শুনিয়েছে। কাজেই আমার আশা কোথায়।'

যেন হো হো করে হেসে উঠতে চেয়েছিল সুদাম।

'ও, তুমি ভবিষ্যতের কথা বলছ—মানে যদি কোনদিন বিয়ে-টিয়ে করে ঘর-সংসার পাতি তখন তোমায় কেমন করে খাওয়াব কি পরাব সেই ভাবনা ?'

'মেয়েছেলের ভবিষ্যৎ ভাবতে হয়। মেয়েরা কিছু চিরকাল উড়ে উড়ে মধু খায় না।' বেশ কড়া করে কথাটা বলে শোভা জানালার কাছে সরে গিয়েছিল। একটা বড় আয়নায় ওর পিঠটা দেখা যাচ্ছিল। ভূষণ পোদ্দার সাবেকী বাল্‌ব সরিয়ে দিয়ে ঘরে নূতন আলো বসিয়েছিল। জ্যোৎস্নার মতো সবুজ-সাদা ঠাণ্ডা আলোর নিচে শোভার রং যেন আরো খুলে গিয়েছিল। হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সুদাম আয়নার ভিতর মূর্তিটা দেখছিল। দুধে আলতায় ছোপানো মসৃণ ঘাড় বেয়ে কালো সাপের মতো ভয়ংকর চকচকে লম্বা বেণীটা গোলাপী ব্লাউজের চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে পাতার রঙের শাড়িতে মোড়া কোমরের নিচে এসে ঝুলছিল। চোখ ফেরাতে পারছিল না সুদাম কতক্ষণ সেদিক থেকে। যেন আরো কি কি বলছিল শোভা। কিন্তু সুদাম একদৃষ্টে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে শোভা ঘুরে দাঁড়াল।

'কথা বলছ না কেন।'

'তুমিই তো বলে যাচ্ছ।' সুদাম আবার হাসতে গেল। শোভা ঠোঁট বেঁকাল।

'পূজো গেল। একটা ব্লাউজ-পীসও প্রেজেন্ট করতে পারলে না, প্রেম করছ। তাইতো বলি আমার আশা কোথায়।'

সুদামের হাসি নিবে গেল। মুখটা কালো হয়ে গেল। ছোট একটা ঢোক গিলল। শোভার চোখে চোখে আর না তাকিয়ে ঘাড় গুঁজে হাতের নখ খুঁটতে লাগল।

শোভা চুপ করে রইল।

'ঠিক আছে।' সুদাম চোখ তুলল। ব্লাউজের কাপড় আমি কালই এনে দেব।'

'ও, বলেছি বলে!' শোভা মাথা নাড়ল। 'ব্লাউজ কি আর আমি পরছি না। আমার এক ডজন ব্লাউজ। একটা কথার কথা বলছিলাম। তাও কি আর তুমি নিজে উপায় করে আমার জন্য ব্লাউজ কিনে আনবে। পারবে না। বাড়ির তহবিল থেকে যদি দুটো টাকা সরাতে পার। যেমন দুদিন সরিয়ে আমায় সিনেমা দেখিয়েছ, রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেছ। তা ছাড়া আরো যে কতদিন সিনেমা দেখা হয়েছে রেস্টুরেন্টে খাওয়া হয়েছে সে টাকা আমি দিয়েছি—দিইনি?'

'আমি কি না বলছি।' সুদামের দু চোখ ছলছল করছিল। যেন কেঁদে ফেলবে। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। 'আমার সেই খেয়াল আছে। টাকা রোজগার করতে হবে। অনেক টাকা উপায় করতে না পারলে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না। আমি জানতাম। আমি জানি।' বলে সুদাম হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর একটা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আর একজন মুখে কাপড় গুঁজে হাসছিল। সুদাম বেরিয়ে যেতে বিমলা ভিতরে চলে এল।

'খুব বলা হয়েছে।' শোভার চিবুক ধরে সে জোরে নাড়া দিল। 'খুব বলেছ।'

'কিন্তু আমার মনে হয় একটু বেশি বলা হয়ে গেল।' যেন শোভার এখন হুঁশ হয়েছে। চোখ মুখের কড়া ভাবটা নেই। চাউনিটা একটু মলিন নিষ্প্রভ। যেন ভয় ঢুকেছে।

'যদি আর না আসে?' বিমলার হাত ধরল শোভা।

'আসবে না মানে!' আকাশ থেকে পড়ল বিমলা এমন চোখ করে শোভার দিকে তাকায়। একটু সময়। তারপর শোভার গালে আঙুলের টোকা দিল।

'আসতেই হবে। ঘুরে ফিরে এখানেই আসবে। ধান খেয়েছে মুর্গি যাবে কোথায়?'

তারপরও বিমলা শোভার কানে কানে কি বলতে শোভা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

'ইস কি অসভ্য বৌ তুমি। মাইরি বলছি না।'

'আচ্ছা দেখা যাবে। আমিও মরব না।' খোপা খুলে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিমলা খোপা ঠিক করছিল। চুল না যেন অন্ধকার সমুদ্রের ফেনা। স্থির চোখ মেলে শোভা চুলের রূপ দেখছিল।

'কিন্তু যা-ই বল ভাই, তোমার এখানে এসে একটু হাসি-ঠাট্টা করি ইয়ার্কি-ফাজলামি করি। সময়টা কাটে। নিচে গেলে মনটা যেন কেমন হয়ে যায়।'

বিমলার কথা শুনে শোভা চমকে উঠল। আর একদিন চমকে উঠেছিল। কথাটা বিমলা আর একদিন বলেছিল। যেন তাদের পরিচয়ের প্রথম দিকে। কিন্তু আজ তুজনের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। তাই আজ শোভা শুধু শুনল আর চুপ থাকল না। বিমলার হাত ধরল।

'কেন, খারাপ লাগে কেন। তুমিই তো বল, দেবতার মতন শ্বশুরশাশুড়ী। অসিতদাও ভাল মানুষ। বিদ্বান বুদ্ধিমান। স্বভাবটি চমৎকার নরম শান্ত। স্বামী হিসাবে এমন মানুষ হয় না। তোমার মুখেই শুনি। অমলদাও তোমায় ভালবাসে—কিন্তু কেন যে মাঝে মাঝে—'

বিমলা চুপ। চুপ থেকে হাতের আঙুল মটকায়। আঙুলের পটপট শব্দ হয়। নিচে ভূষণ পোদ্দারের সোনার দোকানে ঠুকঠাক শব্দ হয়। কারিগররা কাজ করছে। ভূষণও কাজ করছে। বিমলাদের ওদিকটা চুপচাপ নিঃসাড়। অফিস থেকে ফিরে অসিত আবার বেরিয়েছে। একটা টুইশনি নিয়েছে। বাড়তি আয়ের দরকার। অমলও সন্ধ্যার পর ছাত্র পড়ায়। এসব না করলে এত বড় পরিবারের খরচ শুধু অসিতের চাকরির টাকা দিয়ে কুলোয় না। তা ছাড়া অমলের কলেজের মাইনে আছে। ব্রজবিহারীবাবুও এসময়টায়

একটু বেড়াতে বেরোন। প্রথমে একটা পার্কে যান। তারপর পাড়ার কালীমন্দিরে এসে সেখানে বসে থেকে অনেকটা সময় কাটান। তাঁর ফিরতে সেই রাত দশটা। শাশুড়ী বিছানায় শুয়ে থাকেন বা ঘুমোন। ঠিকে ঝি বাটনা বেটে জলটল তুলে একটু ধোয়ামোছার কাজ সেরে দিয়ে সন্ধ্যাবাতির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। বিমলা একলা বসে রান্না করে। তারপর একসময় ফাঁক বুঝে ওপরে শোভার কাছে চলে আসে। যেমন এখন এসেছে।

'আমার মনে হয় যদি একটু বেড়াতে টেড়াতে যেতে—' অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর শোভা তাই ঠিক করল, হয়তো সারাক্ষণ ঘরে থেকে বিমলা মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। 'ছুটির দিন অসিতদা বা অমলদাকে বলে যদি এক আধটা সিনেমা দেখে এসো—'

'মন ভাল হয়ে যাবে কেমন না?' শোভার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিমলা খিলখিল হেসে উঠল।

শোভা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এমন ভাবে বৌটি হাসছে যেন বেড়ানো কি সিনেমা দেখাটা কিছু না। ভয়ংকর বাজে জিনিস।

তাই শোভা আবার চিন্তা করতে লাগল। বিমলার কি নেই ও কি পেলে তার মন ভাল হবে, উদাস ভাবটা কেটে যাবে। ভাবতে ভাবতে শোভা এক সময় ফিক করে হাসল।

'কি বুঝলে ভাই!' বিমলা প্রশ্ন করল।

'এবার ঠিক বুঝে নিয়েছি।' শোভা ঘাড় কাত করল।

'শুনি?' বিমলা ঝুঁকে দাঁড়াল।

শোভা কানে কানে কথা বলল।

শুনে বিমলা এবার ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। অর্থাৎ এটাও তার কাছে বাজে জিনিস। এই জিনিস পেয়ে বিমলার মনের ভার দূর হবে না।

'বুঝলে ভাই, বরং আমিই বাধা দিচ্ছি—সে চাইছে সন্তান। একটা খোকা। কিন্তু অত চট করে আমার মা হবার ইচ্ছা হয় না।

ভাল করে দু বছরও পুরল না বিয়ে হয়েছে। এখনই কি ওসব ভাল লাগে।'

শোভা অবাক হয়ে রূপসী বিমলাকে দেখতে লাগল। এ কেমন মেয়ে? মার মুখে সে শুনত খোকা কোলে না আসা পর্যন্ত মেয়েরা শান্তি পায় না। মন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে বুক খালি ঠেকে, ঘর দোর শূন্য মনে হয়। কিন্তু বিমলা যে তা-ও চাইছে না।

তবে সে কি চাইছে?

স্বামী ভাল মানুষ। শ্বশুরশাশুড়ী ভাল। দেওরটিও ভাল। তেমন কিছু অভাব অনটনের মধ্যেও নেই। তবে কেন ও ছটফট করছে। কিসের অশান্তি?

'চলি ভাই।' বিমলা ঘুরে দাঁড়ায়। আয়নায় নিজের মুখখানা দেখছিল। যেন দেখে তৃপ্ত হয়ে কালো ডাগর চোখ দুটো শোভার দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'একটু বলা ভাল। বেটাছেলে। না বললে টললে ওদের হুঁশ হয় না। কিন্তু আসবে—আবার ঠিক আসবে। চিন্তা করো না।'

বিমলা নিচে চলে গেল।

ভুরু কুঁচকে শোভা একটা কথা চিন্তা করতে লাগল।

হারান মুদির দোকানের পিছনে তেঁতুলতলার আড্ডায় আজ তারা ভয়ানক নিচু গলায় কথা বলছে।

অনেক সময় কথা না বলে কেবল হাত ও হাতের আঙুলের ইশারা করে তারা মনের কথা বোঝাতে চেষ্টা করছে।

আজ তিন বন্ধু ছাড়া আর কেউ আড্ডায় উপস্থিত নেই। যেমন দুদিন তপনের মামাতো ভাই হাবুল এসেছিল। কিন্তু ভল্টু আপত্তি করাতে তপন আজ হাবুলকে সঙ্গে আনেনি। কেননা আজ তারা ভয়ানক একটা গোপনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। শত হোক হাবুল বাইরের লোক। তাকে এ ব্যাপারে টেনে আনার অসুবিধা তো বটেই বিপদও আছে।

তা ছাড়া, মফঃস্বলের ছেলে।

গেঁয়ো ভাবটা এখনো পুরোপুরি রয়ে গেছে।

কলকাতা শহরের জল লেগে আর একটু ধোপদুরস্ত না হওয়া পর্যন্ত 'প্রাইভেট' আলোচনায় ওই ছোঁড়াকে উপস্থিত থাকতে দেওয়ার 'রিস্ক' আছে।

আজ আর আলাদা আলাদা বাক্স নিয়ে তারা বসেনি।

তিন চারটে বাক্স একত্র করে তার ওপর তিনজন গোল হয়ে বসে ফিসফিস গুজগুজ করছে।

অ্যাসিড কারখানার 'গোপী সিং' একবার হাঁটতে হাঁটতে তেঁতুল-তলায় এসে বাবুদের কাছে 'শলাই' আছে কিনা জানতে এসেছিল। গোপীর খড়মের খটাখট শব্দ শুনে তিনজনে ভয়ংকর চুপ করে গেছে। রবিবার। অ্যাসিড কারখানা ছুটি।

কিন্তু দারোয়ান যে ওদিকের অন্ধকারে বসে আছে, তাদের মনে ছিল না। উনন ধরাতে দেশলাই চাইতে এসেছে। ভল্টু পকেট থেকে দেশলাই বার করে তৎক্ষণাৎ গোপী সিং-এর হাতে তুলে দিয়েছে। উনুনে আগুন দিয়ে গোপী সিং দু মিনিট পর দেশলাই ফিরিয়ে দিতে এসেছিল। দারোয়ান চলে যেতে আবার তিনজন গুরুতর বিষয়টা নিয়ে পরামর্শ আঁটছিল। আর এখানে কেউ আসবে না। এখন তারা অধিকতর নিশ্চিন্ত হয়ে আলোচনায় ডুবে গেল।

দেখা যাচ্ছিল তিন জনের মধ্যে সুদামের উৎসাহটাই বেশি। তপার খুব একটা উৎসাহ না থাকলেও এমন কিছু একটা করা গেলে মন্দ হয় না এমন ভাব।

কিন্তু তাদের সব বুদ্ধি পরামর্শ দেবার গুরু ভল্টু। তার মাথা পরিষ্কার। মানুষটাও ধীর স্থির।

হুটহাট করে সুদাম তপা যখন এক একটা প্রস্তাব দিচ্ছিল ভল্টু হাতের ইশারায় তাদের চুপ করতে বলছিল।

'বুঝলি কেবল প্ল্যান আঁটলে হয় না। কাজ হাসিল করার মতন মালমসলার যোগাড় আগে চাই।'

'রিভলবার অবশ্য একটা যোগাড় করা যায়'—তপা প্রস্তাবটা শুরু করেছিল মাত্র। ভল্টু একটা কিল দেখিয়ে চাপা গর্জন করে তাকে থামিয়ে দিয়েছে।

'হ্যাঁ বাবা জানি, তোর মেসোর একটা মান্ধাতার আমলের পুরোনো রদ্দি রিভলবার আছে। না হয় সেটাই হাতে এল। হয়তো মেশিন বিগড়ে আছে। একশ বার ঘোড়া টিপলে গুলি ছুটে বেরোবে না, আওয়াজ হবে না। আচ্ছা না হয় তাই হল। ওটা দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু মেসোর অস্ত্রটা সরাবি কি করে শুনি?'

'চুরি করতে হবে।' সুদাম বলছিল।

'তাই বল।' ভল্টু এবার সব কটা দাঁত বার করে শব্দ না করে

হাসল। 'মানে রিভলবার চুরির জন্য আর একটা নতুন প্ল্যান ফাঁদতে হবে। তার মানে বড় কাজটা হাসিল করার আগেই আর একটা রিস্ক নেওয়া। হয়তো ওই রিভলবারের জন্য তিন জনকে আগে বেঁধে ফেলবে।'

ভল্টুর কথা শুনে সুদাম বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল।

'আমি আজ সকালে উল্টোডাঙ্গা গিয়েছিলাম। হুঁ আমার ওল্ড ফ্রেণ্ড নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে।'

'কোন্ নিতাই ?' তপা ভুরু কুঁচকালো।

'উল্টোডাঙ্গায় নিতাই ঘোষ আবার কটা আছে শুনি ?' ভল্টু বিরক্ত গলায় বলল, 'নিতাই ঘোষ বলতে একজনই আছে। আমার ফ্রেণ্ড, অনেক দিনের ফ্রেণ্ড। এই টল্ ফীগার, এই হাতের কব্জা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সব সময় সিল্কের ট্রাউজার সিল্কের জামা পরে আছে। হাতের ঘড়িটার দাম কত ! তার আবার সোনার ব্যাণ্ড্।'

'বড়লোকের ছেলে ?' সুদাম ঢোক গিলছিল।

'বড়লোকের ছেলে হতে যাবে কোন্ দুঃখে। বাপের পয়সায় বাবুগিরি করার মতন বোকা ক্যাবলা নিতাই ঘোষ কিনা। নিজের হাত আছে বুদ্ধি আছে। এই কলকাতার শহরে নিতাইয়ের মতন পরিষ্কার মাথা কটা লোকের আছে শুনি ? বাপ ঠাকুর্দার পয়সা কদিন ? নিজের হিম্মৎ না থাকলে কিছু না।'

'তা বটে তা বটে।' তপা সুদাম একসঙ্গে মাথা নাড়ল।

'যাক অত কথায় দরকার নেই, আমি নিতাইয়ের সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি। একটা দুটো যা দরকার নিতাই আমাদের সাপ্লাই দেবে।' ভল্টু একটা সিগারেট ধরাল।

'দাম ?' সুদাম ও তপন একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'দাম—হাঁ, তা—একটা যা হোক ধরে দিতে হবে বৈকি। দামটা এখনই সে আর কিছু চাইছে না।' ভল্টু এতটা ধোঁয়া ছড়িয়ে জায়গাটা অন্ধকার করে দিল।

যেন তেঁতুল গাছের মাথায় একটা কাক বাসা বেঁধেছে, ঘন ঝাঁকড়া পাতার জন্য দেখা যাচ্ছে না। গলা ভাঙ্গা স্বরে কাকের বাচ্চা শব্দ করে ডাকছে। কাকের বাসায় কোকিলের ছা। আসলে ওটা কোকিলের বাচ্চা কিনা সুদাম ঘাড় তুলে তেঁতুলের কোমল কচি ঝকঝকে পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছিল।

'দাম তো বড় কথা না। এখন আমাদের তৈরী হতে হবে আসল কাজের জন্য'—ভল্টু বলতে আরম্ভ করেছিল, সুদাম এমন একটা বাজে প্রশ্ন করে বসল, ভল্টু রেগে গরম হয়ে উঠল।

'যা তা বলছিস, কেমন না?' মাত্র তিনটে কি চারটে টান দেওয়া হয়েছিল সিগারেটে—হাত থেকে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভল্টু। 'বেশ তো তোরা যদি ভাল ক্র্যাকার কোথাও থেকে যোগাড় করতে পারিস কর না। পয়সা দিয়ে কিনতে হবে সব জায়গা থেকেই। আমার আপত্তি নেই। বেশ তুই ওটার ভার নে। কি বলিস তপা?'

তপা কথা বলল না।

যেন মহা অপরাধ করেছে কথাটা জিজ্ঞাসা করে এমন চেহারা করে সুদাম ফের ওপরের তেঁতুল পাতা দেখতে লাগল।

'জিনিস ভাল হবে কিনা? না হয় তুই একবার তোর ঘরে ফাটিয়ে পরীক্ষা করিস।' এবার আর ততটা রাগের সুর না, যেন ঠাট্টা করে ভল্টু বলল, 'দেখবি তখন নিতাই ঘোষের হাতের তৈরী বোমার জোর কত। কি বলিস তপা?'

তপা শব্দ না করে দাঁত বার করে একটু হাসল।

'ভেতরের কথা বলতে নেই। কিন্তু তোরা মাঝে মাঝে এমন বিদ্‌ঘুটে সব প্রশ্ন করিস?' ভল্টু হাত বাড়িয়ে মাটি থেকে পোড়া সিগারেটটা তুলে নিল। 'সেবার বীডন স্ট্রীটের হরেকৃষ্ণ সাহার হার্ডওয়ারের দোকানের সিন্দুক ভেঙ্গে টাকাটা যারা নিয়ে গেল তারা সঙ্গে কি নিয়ে এসেছিল শুনি? দারোয়ানটার মাথার খুলি উড়ে গেল দু দুটো পুলিস জখম হল—'

তপা তাড়াতাড়ি বলল, 'ওরা মোটর গাড়ি চেপে এসেছিল। তাই তো পালাবারও সুবিধা হল। গাড়ি থেকে ক্র্যাকার ছোড়ার সুবিধা ছিল।'

'হ্যাঁ তা ছিল—কিন্তু জিনিসগুলো কেমন কাজ দিয়েছিল আগে শুনি? নিতাই ঘোষের হাতের তৈরী বোমা সঙ্গে ছিল বলেই পুলিস-ভ্যানটাকে ওরা অত সহজে খোঁড়া করে দিতে পারল। না হলে যেমন ভাবে তাড়া করেছিল—'

ভল্টুর কথা শুনে সুদাম ও তপন ভাবতে লাগল।

'কাজেই জিনিস খাঁটি হবে কিনা তাজা হবে কিনা আমাদের দেখতে হবে না। নিতাই যা আমাদের হাতে তুলে দেবে সেটা মোক্ষম হবে। এখন বাবা ঠিক কর কবে তোমরা কাজে নামবে।'

'ওদিকের রাস্তাঘাটের একটা নক্‌শা তৈরি করে ফেলতে হয়।' তপা বলছিল। ভল্টু উঠে দাঁড়াল। দু হাত ছড়িয়ে শরীরের আড়মোড়া ভাঙ্গল। নক্‌শা আবার কি—নেবুতলা আর তালতলার রাস্তাঘাট গলিঘুঁজি আমাদের মুখস্থ। তুই আমি কি সুদে তো আর আসাম থেকে আসিনি। পার্ক সার্কাস টু শ্যামবাজার আর ইণ্টালী টু ধর্মতলা—কোন্ রাস্তাটা আমাদের অজানা আছে কোন্ গলিটা আমাদের অচেনা আছে শুনি? নক্‌শার জন্য আটকাবে না—না হয় নক্‌শা আমি একটা করে নেব।'

'তা তুই এখন চললি কোথায়?'

তপার চোখের দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে ভল্টু আস্তে একটা শিস দিল। তারপর অল্প একটু হাসল।

'মধু খেতে।'

তপা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'তবে আর কি। এখন তোকে ধরে রাখে কোন্ শালা। কটা বাজে?'

'চারটে বেজে গেছে।' ভলটু হাতের ঘড়ি দেখল।

তপা আর কিছু বলল না। সুদামও চুপ করে রইল।

'তোরা আগে ঠিক কর কি করবি। সাহস করে কাজে নামতে চাস তো আমি সব ব্যবস্থা করে দি। বৌবাজারের সিধুর সঙ্গে কথা হয়েছে। সিধু বলেছে দু থেকে তিন—তার বেশি লোকের দরকার হবে না। কেননা অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। তা ছাড়া এসব ব্যাপারে হুট করে আজেবাজে লোককেও নেওয়া যায় না, কাজেই' —আর একবার ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে ভলটু বলল, 'চলি আমি, কাল সকালে বাড়ি থাকব, দেখা করিস—এখন আর দাঁড়াতে পারছি না।' ভলটু হাঁটতে আরম্ভ করল। সুদাম ও তপন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। কালো লম্বা কাঠামোটা হারান মুদির দোকানের পাশের সরু রাস্তাটা ধরে ধীরে ধীরে সরে গেল। তারপর ভলটুকে দেখা গেল না।

ভলটু চোখের বাইরে চলে যেতে সুদাম নাক দিয়ে একটা শব্দ বার করল।

'ওর হয়ে গেছে—রোজ একটা পাঁইট চাই।' তপন সুদামের চোখ দেখল।

'পাঁইট চালাচ্ছে, কি বোতল চালাচ্ছে কে বলবে।'

'যদ্দিন বাপ বেঁচে আছে চালিয়ে যাবে—তারপর দেখা যাবে চাঁদ কি করে।' যেন অনেকটা নিজের মনে সুদাম বলছিল। তপন হাত নেড়ে সুদামকে থামিয়ে দিল। 'যাক গে। খেয়ে সুখ পাচ্ছে খেতে দে। আমাদের এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। এখন কথা হচ্ছে ও যেসব কথা বলে গেল তুই রাজী আছিস?'

সুদাম মাথা নাড়ল।

'মাথা খারাপ! কোথাকার বৌবাজারের সিধু গুণ্ডা আর উল্টোডাঙ্গার নিতাই ঘোষ। সব শালা দাগী। ওদের সঙ্গে মিশে কাজ করতে গেলে হয়েছে আর কি!'

তপন চুপ করে রইল।

সুদামও ভাবতে লাগল। ভল্টুর প্রস্তাব তাদের মনঃপূত হয়নি। আগেও হয়নি। কেননা তপন সুদাম চেয়েছিল প্রথমে ছোট খাট একটা কাজে হাত দেয়। বিশেষ এসব ব্যাপারে তারা একেবারে আনাড়ী। দুজনেরই টাকার দরকার। কিন্তু কথায় বলে সিধা আঙুলে ঘি ওঠে না। চাকরিবাকরির সুবিধা তারা কোনদিন করতে পারবে না। তেমন পুঁজি নেই ব্যবসা করবে দোকান-টোকান খুলে বসবে। কে একজন তপনকে পরামর্শ দিয়েছিল শেয়ালদা থেকে সস্তায় কিছু আনাজ কিছু ফল যেমন আম জাম কলা কিনে এনে পাড়ায় বসে বিক্রি করা। প্রস্তাবটা শুনে তপনের এত রাগ হয়েছিল। না অতটা নিচে সে নামতে পারবে না। টাকার দরকার বলে কি মাথায় করে কলার ঝুড়ি নিয়ে সে পাড়ায় ঢুকবে। তার চেয়ে বাসার চাকর হওয়া ঢের ভাল। রেস্টুরেন্টের বয়ের চাকরি নেওয়া অনেক বেশি সম্মানজনক। সুদাম তাই বলে। না, এভাবে পয়সা কামানো তাদের পোষাবে না। ইস্ত্রি করা ট্রাউজার শার্ট যারা গায়ে দেয়, দিনে দু চার প্যাকেট করে সিগারেট ওড়ায়, তারা পয়সার জন্য ফেরিওয়ালা সাজতে পারে না। তাছাড়া ভাতকাপড়ের জন্য তো আর তারা রোজগার চাইছে না। বাপ দাদারা যা রেখে গেছে তা দিয়ে তাদের চলে যাচ্ছে। পয়সার দরকার তাদের ব্যক্তিগত খরচের জন্য। সিনেমা রেস্টুরেন্ট, একদিন অন্তর নাপিতের দোকানে ঢোকা, হুটহাট ট্রামে বাসে চাপা, দরকার মতন ট্যাক্সিটা রিক্শাটা ডাকা, আর—আর তাদের পোশাক। পোশাকটাই বড় খরচ। জুতো জামা ক্রমাগত পুরোনো হচ্ছে, অতিরিক্ত ধোলাই ও ইস্ত্রি খেয়ে সকাল সকাল ছিঁড়ছে, ফেটে যাচ্ছে—দু মাস অন্তর নূতন ট্রাউজার শার্ট গেঞ্জি আণ্ডারওয়ার রুমাল টাই মোজা কত কি কিনতে হচ্ছে। এসবের জন্য বাড়িতে রোজ হাত পাতা যায় না। বাড়ির লোক ক্ষেপে যায় তাই তারা ভেবেছিল একটা কিছু করা যায় কিনা—যাতে কিছু থোক টাকা হাতে আসে।

তেঁতুলতলার আড্ডা থেকে সুদাম সেদিন যখন রাত করে বাড়ি ফিরছিল তখন তার মাথায় চিন্তাটা এসেছিল। সে দেখছিল সি. সরকারের জুয়েলারী দোকানের পাশের দোকানের নবীন সাহা সারাদিনের বিক্রির টাকা কোঁচায় বেঁধে একটা অন্ধকার গলির পথে ঘরে ফিরছে। নবীনের কাপড়ের দোকান। গঙ্গা বস্ত্রালয়। বেশ ভাল ব্যবসা করছে লোকটা। সারাদিন খদ্দেরের ভিড় লেগে থাকে ঐ দোকানে। কম করে হলেও পাঁচ সাতশ টাকা আমদানি হয় রোজ। যদি ঐ অন্ধকার গলিতে নবীনকে জাপটে ধরা যায় ও ছোরাটোরা দেখান যায়, টাকাটা কেড়ে নেওয়া খুব একটা শক্ত হয় না। সেদিন বাড়ি ফিরে সুদাম বিষয়টা চিন্তা করছিল। যদি তারা তিনজনে মিলে কাজটা হাসিল করতে পারে তো পাঁচশ টাকার তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুশ করে টাকা মাথাপিছু পেয়ে যায়। এক সন্ধ্যার রোজগার মন্দ হয় না কিছু।

পরদিন তপাকে বলতে তপা রাজী হয়ে যায়। কিন্তু ভল্টুর কাছে কথাটা তুলতে ভল্টু হেসে ফেলেছিল। বলছিল মাছি মেরে হাত কালো করা তার পোষাবে না। মারি ত হাতিই মারব, লুঠ করব তো রাজার ভাণ্ডার লুঠে নেব। তারপরই ভল্টু প্রস্তাব দিয়েছিল সি. সরকারের জুয়েলারী দোকানে হানা দিয়ে সোনাদানা লুঠ করার।

তপন ও সুদাম ফ্যালফ্যাল করে ভল্টুর চোখের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো শুনছিল। মাথাপিছু দশ বিশ ত্রিশ হাজার টাকা হাতে এসে যাবে। হয়তো আরো বেশি।

প্রস্তাব শুনে সুদাম ও তপা সেদিন রাজী হয়ে গিয়েছিল বটে। কিন্তু যতই তারা বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছিল নানারকম সমস্যা তাদের সামনে হাজির হচ্ছিল। প্রথমত এত এত গয়না-গাঁটি এনে তারা কোথায় লুকিয়ে রাখবে। একদিনে কিন্তু সব জিনিস বিক্রি করা যাবে না। তাছাড়া সব গালিয়ে নিতে হবে, এর জন্য জানা

কোনো স্যাক্‌রার শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য, ভল্টু সমস্যাগুলি এক এক করে কি করে সমাধান করা যেতে পারে বলে যাচ্ছিল। ভল্টুর অনেক দিন থেকে নজর এই জুয়েলারী দোকানটির ওপর। কাজেই এ নিয়ে সে অনেক দিন থেকে ভাবছে। ভল্টুর জানাশোনা বিশ্বাসী স্যাকৃরা আছে। সোনা গালিয়ে বেচে দিতে বেগ পেতে হবে না। হয়ত লোকটা কিছু বখ্‌রা নেবে। তারপর তপা অস্ত্রের কথা তুলেছিল। খালি হাতে তো আর অত বড় দোকানে হানা দেওয়া চলবে না। ভল্টু উত্তর করেছিল তার জানাশোনা লোক আছে। সে কথা বলে দেখবে, অস্ত্র যোগাড় করা কঠিন হবে না। পরদিন ভল্টু উল্টোডাঙ্গার নিতাই ঘোষের কথা বলেছিল। চমৎকার হাত-বোমা তৈরি করে। কথাটা বলে ভল্টু আবার তখনি বলেছিল বৌবাজারের সিধুকে সঙ্গে রাখতে হবে। কেননা শহরে যতগুলি জুয়েলারী দোকান আছে সব কটা দোকানের নাড়ি নক্ষত্র সিধুর জানা আছে। তারা দু-পাঁচটা দোকান লুঠ করেছে। কোথায় দোকানের আয়রন সেফ্‌ লুকোনো থাকে, কি রকম চাবি থাকে সিধুর সব মুখস্থ।

ভল্টুর কথা শুনে সুদাম ও তপন তিনদিন ধরে কেবল ভাবছিল। কিন্তু বৌবাজারের সিধু উল্টোডাঙ্গার নিতাই ইত্যাদি বড় বড় পাণ্ডার নাম শুনে তারা যেন কেমন ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

সুদাম তপনকে সেকথাই বলছিল। যেন এখন তারা সাহস প্যাচ্ছে না। ছোটখাট ছিনতাই ও লুটের কথাই তারা চিন্তা করছিল। এতবড় একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে রীতিমতো ভয় পাচ্ছে।

'তোর মনটা ভাল নেই মনে হচ্ছে?'

সুদাম তপার দিকে চোখ তুললো। তার কথার উত্তর দিল না। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'একটা বিড়ি দে।'

তেম্নি চুপ থেকে সুদাম তপার হাতে বিড়ি দেশলাই তুলে দিল।

বিড়ি ধরিয়ে তপা পা দুটো সামনের দিকে একটু টান করে ছড়িয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে 'আঃ' করে উঠল। যেন এতক্ষণ একটা শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক উত্তেজনায় ভুগছিল সে। এখন শরীর ছড়িয়ে দিয়ে আরাম করে বিড়ি টেনে মনের চঞ্চলতা ও শরীরের গ্লানি ঝেড়ে ফেলেছে।

'না রে—ওসব বড় বড় ব্যাপারে আমরা যাব না।' এতটা ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে একসঙ্গে বার করে দিল তপা। 'ধরা পড়লে ক্যাপিট্যাল পানিশমেণ্ট—হয় ফাঁসি নয়তো সারাজীবন জেলখানায় পচে মরা। দেখলি না হরীতকী বাগান লেনের সেই শেঠের বাড়ির ডাকাতির মামলায় কত জনকে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দিল। নমস্কার বাবা—দুনিয়ার সুখভোগ কিছুই করলাম না—ভাল করে সংসারটাকে ছাই এখনও জানাই হল না—এখনি ফাঁসিকাঠে ঝুলতে যাব কোন্ দুঃখে—কি বলিস সুদে?'

সুদাম আবার একটা লম্বা নিশ্বাস ত্যাগ করল।

'তোর কাছে দুটো টাকা হবে তপা?'

তপা হঠাৎ অবাক হল। সুদাম বড় একটা ধার কর্জ করে না। বরং তপার এই দোষটা আছে। কথায় কথায় সে বন্ধুদের কাছে হাত পাতে। এই সুদামের কাছ থেকেই কতদিন সে টাকাটা আধুলিটা ধার করেছে। হয়তো সব এখনও শোধ করা হয়নি। হয়তো সুদামও সেসব হিসাব ভুলে গেছে।

'হঠাৎ তোর টাকার দরকার পড়ল!' তপা অবশ্য তৎক্ষণাৎ জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। পকেটটা একটু হাতড়ে নিয়ে পরে মুখ শুকনা করে বলল, 'চার আনার মতো পয়সা আছে—দু টাকা তো হবে না সুদে।'

'থাক।' গম্ভীর গলায় সুদাম বলল, 'একটা ব্লাউজ-পীস কিনতে হবে।'

'টগরের জন্য?'

'হুঁ—হ্যাঁ।' সুদাম আস্তে আস্তে বলল, 'কাল সিনেমায় রেস্টুরেন্টে বেশ কটা টাকা বেরিয়ে গেল। টগর ব্লাউজ কিনতে দিয়েছিল। ওর টাকাটা খরচ করে ফেলেছি।'

'আমি—আমি সোমবার নাগাদ দু টাকা তোকে দিতে পারব।' তপা যেন সুদামকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সুদাম শুকনা গলায় হাসল।

'নারে তোকে ব্যস্ত হতে হবে না—টাকা আমার হাতে ঠিকই এসে যাবে—দুটো তো টাকা। দেখি—কাল সকলে ওদিকে বেরোলে কাপড়টা কিনে আনব।' বলতে বলতে সুদাম উঠে দাঁড়াল।

'এখন কোন্‌দিকে যাবি ?'

সুদাম তপার দিকে তাকাল না। আকাশের দিকে চোখ দুটো তুলে দিয়ে হঠাৎ কি যেন ভাবল, প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'এই সুদে শোন।'

'কি ?'

'বিনুর বোনের খবর শুনেছিস ?'

সুদাম এবার ঘাড় নামাল। দাঁত বার করে তপা হাসছে।

'কৈ না তো—কি আবার ?' খুব একটা উৎসাহ দেখাল না যদিও সুদাম। বিনু তাদের পাড়ার ছেলে। বিনুর বোন হেনাকে সুদাম চেনে। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। চোখের পাতা দুটো বেশ সুন্দর। পাখির পালকের মতন ঘন নিবিড়। তাই চোখ দুটো মনে হয় সব সময় ছায়ায় ঢাকা রয়েছে। তাই মুখটা এত ভাল লাগে। না হলে খুব একটা ভাল না দেখতে। 'কি হয়েছে হেনার শুনি ?' সুদাম ছোট করে একটা ঢোক গিলল।

'ওকে এই দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যে দেখেছিস ?' তেমি দাঁত বার করে থেকে তপা সুদামকে দেখছিল। ঠিক হাসি না। যেন ভিতরে

একটা বিকৃত উল্লাস নিয়ে সে ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে রেখে দাঁত কটা বার করে দিয়েছে।

'কলেজে পড়ে তো—' সুদাম ভুরু কুঁচকালো। বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে হেনা একটা এক্সারসাইজ খাতা হাতে ঝুলিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে যায়। কোনদিন কারো দিকে তাকায় না। এত তাড়াতাড়ি আর কোন মেয়েকে হাঁটতে দেখা যায় না। যেন বাস দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে না গেলে ধরতে পারবে না। বা যেন কোথাও তার সঙ্গে কেউ টেলিফোনে কথা বলতে চাইছে। ফোন ধরে রাখা হয়েছে। হেনা ছুটে গিয়ে কথা বলবে। অথচ সেসব কিছুই না। এম্নি তাড়াতাড়ি হাঁটা ওই মেয়ের স্বভাব। বাসও ধরবে না বা কোথাও কোন টেলিফোন তার জন্য অপেক্ষা করছে না। খামকা তড়িঘড়ি করে রোজ বিনুর বোনের কলেজে হেঁটে যাওয়ার ছবিটা হঠাৎ মনে পড়তে সুদাম একটু হাসল। এবং তার এও মনে হল যেন আজ কদিন সত্যি সে হেনাকে রাস্তায় দেখেনি। 'তুই কিছু জানিস?' সুদাম প্রশ্ন করল।

তপা লম্বা করে ঘাড় কাত করল।

'আমি জেনে গেছি—তুই খবরটা শুনেছিস কিনা জানতে চাইছি।'

'আমি কিছু শুনিনি।'

'তা আর শুনবি কি করে। চেপে রাখা হয়েছে। সহজে কি আর এসব খবর জানতে পারা যায়।'

'তা তুই তো জেনে গেছিস—কি হয়েছে হেনার? কোথায় গেছে?' সুদাম ঈষৎ কৌতূহল প্রকাশ করল।

'বিশুকে চিনিস?' তপা আবার দাঁত কটা মেলে দিল।

'বিশু মানে—রতনবাবুর গাড়ি চালায় বিশু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' তপা জোরে মাথা ঝাঁকাল। সুদাম বুঝল না বিশুর সঙ্গে হেনাকে হঠাৎ দেখতে না পাওয়ার কি সম্পর্ক।

রতনবাবুও এ-পাড়ার মানুষ। ইঞ্জিনীয়ার। চমৎকার বাড়ি হাঁকিয়েছেন মোড়ের মাথায়। দু বছর আগেও ভিতরের দিকের গলিতে একটা টালির বাড়িতে থাকতেন।

'বিশু ড্রাইভার, কি করেছে?' বিড়বিড় করে সুদাম প্রশ্ন করল। যেন অনেকটা ভয়ে ভয়ে। যেন তপার এভাবে বার বার দাঁত দেখিয়ে হাসার মধ্যে এতবড় একটা মজার রহস্য লুকিয়ে আছে। সুদাম কিছুটা আঁচ করেছে। কিন্তু সবটুকু আঁচ করতে সাহস পাচ্ছে না। তাই সুদাম আবার ভুরু কুঁচকে বলল, 'লোকটা তো বুড়িয়ে গেছে। কানের কাছে চুল পাকতে আরম্ভ করেছে রতনবাবুর ড্রাইভারের। তাই না?'

'তাতে কি।' তপা এবার রীতিমত শব্দ করে হাসল। 'বলে কিনা যার সঙ্গে যার মজে মন। ঐ চাল্লিশে পাওয়া শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাসের সঙ্গে বিনুর বোন শ্রীমতী হেনা চক্রবর্তী গত শনিবার ভোর রাত্রে পালিয়ে গেছে।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কতক্ষণ সুদাম।

'বিশ্বাস হচ্ছে না?' তপা তার কাঁধে হাত রাখল।

'তুই ঠিক জানিস?' সুদাম কাঁধ থেকে হাতটা নামিয়ে দিল।

'একেবারে ভিতরের খবর। পাকা রিপোর্ট।' তপা আর একটা বিড়ি ধরাল। 'পিসিমা কাল বিকেলে হেনাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। পিসিমার সঙ্গে হেনার মার খুব ভাব জানিস বোধ হয়। হেনার মা কাঁদাকাটি করল। পিসিমার কাছে খুলেমেকে সবই বলল। হেনার মা দুঃখ করে নাকি এ-ও বলেছিল এমন মেয়েকে আঁতুড়ে কেন নুন দিয়ে মেরে ফেলেনি।'

'অথচ বাইরে থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই।' আবার নিজের মনে সুদাম বিড়বিড় করতে লাগল। 'মুখ দেখে কে বলবে ঐ মেয়ের ভেতরটা এমন। ছি ছি! কলেজে পড়ে—শেষটায় ওই ড্রাইভারের সঙ্গে—তা-ও চুল দাড়ি পাকতে আরম্ভ করেছে লোকটার—'

'মরুক গে মরুক গে।' তপা আর হাসল না। হাতের পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'আমার খুব ভাল লাগছে শুনে। বুঝলি সুদে—বোধকরি এই মজার খবর শুনে আমি যত খুশি হয়েছি পৃথিবীতে এমন আর কেউ হবে না।'

সুদাম হাঁটতে আরম্ভ করছিল। তপাও হাঁটছিল।

'অথচ বেজায় অহংকারী ছিল মেয়েটা।' সুদাম যেন তেম্নি নিজের সঙ্গে কথা বলছিল। 'আশ্চর্য—রাস্তায় কারো দিকে কোনদিন তাকাতই না।'

'অতি চালাকের গলায় দড়ি—' যেন দারুণ আক্রোশে তপা দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। 'একদিন আমি—মাইরী সেদিন আমার হাতে ঘড়ি ছিল না। অয়েলিং করতে দোকানে দিয়েছিলাম। রাস্তায় বিনুর বোনের সঙ্গে দেখা হতে আমি কটা বাজল জিজ্ঞেস করেছিলাম। একটা জায়গায় যাবার তাড়া ছিল আমার তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। উঃ, তোকে কি বলব, এমন কটমট করে মেয়েটা আমার দিকে তাকাল—যেন সময় জানতে চাওয়া নয়—একটা অশ্লীল প্রস্তাব করেছি ওর কাছে—'

'তারপর?' সুদাম দাঁড়িয়ে পড়ল। 'বলেছিল সময়?'

'না তো—কটমট করে খানিকটা আমায় দেখে নিয়ে আবার ঘোড়ার মতো খটখট করে ছুটে চলে গেল।'

'আর তলে তলে তিনি এমন!'

'তাই তো বলছিলাম—অতি চালাকের গলায় দড়ি—এখন বিশু ড্রাইভার ওর তেল মজাবে।'

'তেল মজাবার জন্যই তো ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়েছে।' সুদাম এবার নাকে হাসল। তপা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'না ব্রাদার—এখানে আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না—আসলে শ্রীমতী চালাকী করতে গেছল—ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ির পিছনে তো বিনুরা থাকে। ভেবেছিল বুড়োটাকে একটু খেলাবে,

একটু রগড় করবে ওর সঙ্গে, মজা দেখবে—আর ওই করতে যেয়ে তিনি আটকে গেলেন। যেমন বড়শিতে মাছ আটকায়। আমাদের মতন ভদ্রতা বজায় রেখে পালিশ বজায় রেখে তো আর বিশুর ক্লাশের মানুষেরা পীরিত করতে এগোয় না। তাই বিনুর বোনকে গেঁথে নিয়ে চলে গেল।'

'পুলিসে খবর টবর দিয়েছে?

'পাগল! কেলেঙ্কারি জানাজানি হবে ভয়ে বিনুরা খবরটা চেপে রেখেছে।'

'মানে কিল খেয়ে মুখ বুজে আছে।'

'তা ছাড়া কি।' তপা আর এক দফা হাসল।

'চলি—আমি একটু ওদিকে যাব।' সুদাম সঙ্গীকে এড়াবার জন্য অন্য রাস্তা ধরল।

তার অর্থ এতক্ষণ হেনার খবর শুনে তপার সঙ্গে সে হাসাহাসি করল বটে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আর একটা দুশ্চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

এখন আবার নতুন করে টগরের জন্য সে ভাবছে।

ভূষণ পোদ্দারের চুলেও টাক ধরেছে।

এদিকে সাজগোজের কমতি নেই।

আর রোজ সন্ধ্যার পর বাড়িতে এসে হানা দিচ্ছে। কে জানে হেনার মতো টগর যে ভুল করে বসবে না, বুড়োটার সঙ্গে রোজ যেমন গল্পসল্প হাসাহাসি করছে।

ভূষণের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোভার চেহারাটাও সুদামের চোখের সামনে ভাসছিল।

কাল টক্ করে মেয়েটা এমন একটা কথা বলে বসল। সুদামের হাড়ে তা বিঁধে আছে। যেন এতদিনের ভালবাসাটাসা কিছুই না। যেন একটা ব্লাউজ পীসের মধ্যে মানুষের হৃদয়টা আটকে আছে। না, ঠিক তা তো নয়। আমার এক ডজন ব্লাউজ বাক্সে তোলা

আছে। অর্থাৎ বলছিলাম নিজে উপার্জন করে একটা সুতোগাছিও আমায় প্রেজেন্ট করার ক্ষমতা নেই তোমার।

অপমান! সেই অপমানের জ্বালায় সুদাম কাল রাত থেকে জ্বলছে। এখন ভূষণের কথা মনে পড়াতে সেই জ্বালার সঙ্গে আর একটা ক্রোধ আক্রোশ মিশে সুদামকে অস্থির করে তুলল। যেমন মেয়েটা নিষ্ঠুর তেমনি বাপটা শয়তান। টগরের সর্বনাশ করতে চাইছে বুড়োটা।

শোভা ও শোভার বাবা ভূষণ পোদ্দারের মুখ এখন এক হয়ে গিয়ে সুদামের বুকের ভিতর আগুন জ্বেলে দিল। অপমানের আগুন, আক্রোশের আগুন, বিদ্বেষের আগুন। ভূষণকে শিক্ষা দেবে আর ওই শোভাকেও সে দেখে নেবে! দরকার নেই ব্লাউজ টাউজ দিয়ে। একবার ভেবেছিল চার পাঁচ টাকা খরচ করে এক পীস ডেক্রন কিনে নিয়ে যাবে। টাকায় কুলোবে না বলে তপার কাছে ধার চেয়েছিল। পায়নি যদিও। তপা যে ধার দেবে না সে জানত। সকালে চাউল কিনতে গিয়ে তুটো টাকার মতো সরিয়েছে। হঠাৎ চাউলের দাম বেড়ে গেছে শুনে টগর একটু সন্দেহ করেছিল। কিন্তু সুদাম তা গায়ে মাখেনি। কেননা এভাবে সংসার খরচ থেকে তু চার টাকা না সরালে যে তার পকেট খরচ জুটবে না টগর অনেক দিন আগেই বুঝে গেছে। সন্দেহ করলেও ঠাকুমার কানে যাবে ভয়ে টাকার কথাটা নিয়ে তেমন একটা হৈ-চৈ করে না। অবশ্য তু' তিন দিন ধরে টগরের সঙ্গে তার তেমন কথাবার্তাও নেই। ভূষণের রোজ সন্ধ্যাবেলা এবাড়ি আসা নিয়ে সেদিন রাগারাগি হবার পর সুদামের সঙ্গে ও ভাল করে কথা বলছে না। সুদামের চোখে জিনিসটা খারাপ লাগছে টগরও হয়তো বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তা হলেও ভূষণকে ও নিষেধ করেছে কি? অবশ্য টগরই বা তা সাহস পাবে কেন। ঠাকুমা রয়েছে যে। শয়তানটা যেমন আসত এখনও আসছে। কালও এসেছিল। হয়তো আজও এসে গেছে।

না না, তার এবাড়ি ঘন ঘন আসা বন্ধ করতেই হবে। আর ওই শোভা মেয়েটাকেও জব্দ করতে হবে। আসলে মেয়েটা ভীষণ স্বার্থপর। তুমি অনেক পয়সা রোজগার কর। অনেক কিছু আমায় এনে দাও। তবেই ভালবাসা টিকবে। না হলে সব ফস্কে যাবে।

কেমন যেন উদ্দেশ্যহীন হয়ে সুদাম কতক্ষণ হাঁটল।

একটা রিক্শার গায়ে গিয়ে পড়ল সে। তারই দোষ। কেমন অন্ধের মতো পথ চলছিল। কিন্তু উল্টে সে রিক্শাওয়ালাকে খুব গালমন্দ করল। এমন কি পায়ের চটি তুলে তাকে জুতো পেটা করে শহর থেকে তাড়িয়ে দিবে বলেও শাসালো। লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে সুদামের মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে পরে মাথা নীচু করে চলে গেল। কেন না রাস্তায় আরো দু' চারজন বাবু সুদামের পক্ষ সমর্থন করে রিক্শাওয়ালাকেই গালমন্দ করল। অথচ সত্যি বেচারার দোষ ছিল না। রিক্শায় আলো ছিল। ঠুন্ ঠুন্ করে ঘণ্টা বাজিয়ে সে গাড়িটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যেখানে পাঁচজন বাবু জুটে একরকম কথা বলে একভাবে চোখ রাঙ্গায় সেখানে সে একলা কি করতে পারে।

পরে ঐ লোকটার জন্য সুদামের মনে মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে সে তখন চা খাচ্ছিল। অপরিচিত দোকান। পরিবেশটা নতুন লাগছিল। যেন মানুষগুলি এই শহরের না, এই পৃথিবীর না। মুখে বসন্তের দাগ কালো রং ভয়ানক বেঁটে দেখতে একটা মেয়ে সুদামকে চা এনে দিল। হঠাৎ কোন্ দিক থেকে দুটো ছেলে শিস দিয়ে উঠল। সুদামের এত খারাপ লাগছিল। অথচ পরিচিত পরিবেশে তপা ভল্টু সঙ্গে থাকলে ব্যাপারটাকে সে অন্য চোখে দেখত। তখন আর এমন অসহায়ের মতো কাতর চোখে তাকিয়ে থাকত না। এই শিস দেওয়া নিয়ে একটা ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলত তারা। এ ধরনের মারপিট সুদাম ও তার বন্ধুরা অনেক করেছে। সেবার

নারকেলডাঙ্গার ছেলেদের সঙ্গে বিশ্বকর্মার পূজোর কদিন আগে সামান্য একটা ঘুড়ি নিয়ে কী ভীষণ মারপিট করে এল তারা।

কিন্তু আজ সব কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তার এ-ও মনে হল যেন এখন সে একটা বিশ্রী অবস্থায় এসে পৌঁছেছে! তার আত্মীয় বন্ধু আপন জন বলতে কেউ নেই। ভীষণ একলা সে। নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হচ্ছে তার। এবং সে অবাক হয়ে ভাবছিল একটু আগে গরিব রিক্‌শাওয়ালাকে কি করে চোখ রাঙ্গাতে পেরেছিল। তাও বিনা অপরাধে। আশ্চর্যের কিছুই না—এখন যে নিজেকে সে এত দুর্বল অসহায় মনে করছে, এটা নিশ্চয় তার প্রতি-ফল। খারাপ কাজ করলে তার ফল ভোগ করতেই হয়। লোকটাকে এভাবে পায়ের চটি তুলে শাসানো ঠিক হয়নি। মনে দুঃখ পেয়ে রিক্‌শাওয়ালা তাকে শাপ দিতে দিতে গেছে। তাই তো দোকানের মেয়েটা যখন তাকে চা দিতে এল তখন ওদিক থেকে দুটো ছেলে টিটকারি দিয়ে উঠল, শিস দিল। একটা কথা সে বলতে পারল না। মুখ বুজে অপমানটা সহ্য করল।

তবে একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত হতে পারল।

মানুষের অভিশাপ মানুষের গায়ে লাগে। মানুষকে খামকা দুঃখ দিতে নেই।

যেমন কাল শোভা তার মনে দুঃখ দিয়েছে।

তার ফল শোভাকে ভোগ করতেই হবে। সুদাম মনে মনে তাকে অভিসম্পাত করছে। যদি আর কোন ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয় ও সুখ পাবে না। সারা জীবন দুঃখ পাবে। কাঁদতে হবে। ভীষণ কাঁদতে হবে।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে সুদাম ট্রামে চাপল। ট্রামটা শ্যামবাজার যাচ্ছে দেখেও কি করে সে ওই গাড়িতে উঠে পড়ল

ভেবে পেল না। অথচ একটু আগে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর ওদিকে যাবে না। কোনদিন না।

শোভা বুঝুক সুদাম মনে ব্যথা পেয়েছে।

শোভা বুঝুক ভালবাসা গাছের ফল না। ব্লাউজের জন্য চুলের রবীনের জন্য যে মেয়ে আকৃখুটেপনা করে সেই মেয়ে কোনদিন কোন ছেলের ভালবাসা পায় না। তাকে পস্তাতে হয়। আঙুল চুষতে হয়।

হঠাৎ সুদামের মনে হল শ্যামবাজারের এই গাড়িতে চেপে সে ভালই করেছে। ভূষণ পোদ্দারের বাড়িতে সে ঢুকবে না। বাড়ির পিছনের গলিটা অন্ধকার। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে দোতলা থেকে নীচেটা কিছু দেখা যায় না। অথচ ওদিকে বড় বড় দুটো জানলা আছে বলে ওপরের ঘরের ভিতরটা বেশ ভাল দেখা যায়। গলিতে দাঁড়িয়ে সুদাম দেখবে মেয়েটা কি করছে। যদি মুখ ভার করে জানলার ধারেটারে দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝতে হবে এখন মনে অনুশোচনা এসেছে। খামকা একটা মানুষের মনে ব্যথা দিয়েছে বলে এখন ও অনুতাপ করছে। সুদাম আর ওবাড়ি যাবে না ভেবে মন খারাপ করে লুকিয়ে কাঁদতে টাদতেও পারে। এই দৃশ্য দেখলে সুদামের আর মন খারাপ করার কোন কারণ থাকবে না। তখন না হয় ওপরে গিয়ে একবার ওর সঙ্গে দেখা করে একটা দুটো কথা বলে আসবে। আজ বেশী কথা বলবে না। একটা কি দুটো কথা। তারপর গম্ভীরভাবে চলে আসবে।

আর যদি দেখে অন্যদিনের মতো হাসিখুশি—তেমনি সেজেগুজে আছে, নীচের সেই বৌটার সঙ্গে বসে দিব্যি গল্পসল্প করছে কি হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইছে, তবে তো বোঝাই যাবে তার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ আসেনি—বোঝা যাবে ভূষণ পোদ্দারের মেয়ে ভয়ংকর নিষ্ঠুর।

আর এই নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ কি করে নিতে হয় সুদাম তখন ভাল করে ভেবে দেখবে।

প্রতিশোধ না নিলে সুদাম শান্তি পাবে না। আজ যেমন পাগলের মতো কতক্ষণ রাস্তায় ঘুরেছে এমন করে তাকে বাকি জীবন ঘুরতে হবে। এটা অসহ্য। এমন অবস্থা ভাবা যায় না।

ট্রাম থেকে নেমে সুদাম দুপা পিছিয়ে এসে গলির ভিতর ঢুকল। আজ তার মনে কোনরকম চঞ্চলতা বা অস্থিরতা নেই।

অন্যদিন গলির মধ্যে ঢুকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে ভূষণ পোদ্দারের দোকান বাঁয়ে রেখে সরু প্যাসেজের অন্ধকারে মিশে যায়। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে শোভার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। যেন এক নিশ্বাসে সে পিছনের অন্ধকার পথ ও সিঁড়িগুলি পার হয় তখন।

এবাড়ির সিঁড়ি বারান্দা তার মুখস্থ।

শোভার ঘরের দরজায় পৌঁছে সে সহজভাবে নিশ্বাস ফেলতে পারে। তখন সে রুমাল দিয়ে কপাল ও মুখ মোছে। পকেট থেকে ছোট একটা চিরুনি বার করে মাথার চুলটাও হয়তো একটু ঠিক করে নেয়।

কিন্তু আজ সুদাম অন্ধকার প্যাসেজে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাড়ির পিছনের দরজাটা হাট খোলা হয়ে আছে সত্য—সিঁড়ির টিমটিমে আলোটাও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সুদাম ভিতরে ঢুকল না। বরং দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড় কাত করে ওপরটা দেখতে লাগল।

ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে।

কিন্তু ভিতরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

এক মিনিট দু মিনিট—প্রায় পাঁচ মিনিট সুদাম একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড় কাত করে দোতলার সেই নির্দিষ্ট ঘরটার দিকে তাকিয়ে ছিল। একসময় তার ঘাড়ের এক পাশের রগ টনটন করতে আরম্ভ করল।

সুদাম বিরক্ত হল।

তবে কি ভূষণ পোদ্দারের মেয়ে বাড়ি নেই।

তাই বা কেমন করে হয়।

ঘরে আলো জ্বলছে অথচ শোভা বাড়ি নেই এমনটা বড় দেখা যায় না। তবে যদি বাথরুমে বা নীচের সেই বৌটার কাছে গিয়ে থাকে।

আরও কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল সুদাম।

হঠাৎ তার লোভ হল ভিতরে ঢুকতে।

যদি শোভার অসুখ করে থাকে? কিন্তু অসুখ করলে তো ও বিছানায় শুয়ে থাকবে কি ওদিকের ওই সোফাটায়ই বসে থাকবে।

একদিন শোভার ভীষণ সর্দি করেছিল। সেদিন ও ওই সোফায় বসে আদা-চা খাচ্ছিল সুদামের স্পষ্ট মনে আছে। শোভার সর্দিলাগা মুখটাও তার মনে পড়ল।

নীচের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুদাম শোভার নীল চাদরে মোড়া শূন্য বিছানা ও শূন্য সোফাটা দেখতে পাচ্ছিল। টেবিলটাও দেখা যাচ্ছে। সেখানেও নেই।

ভূষণ পোদ্দার বাড়িতে না থাকলে শোভা বাইরে যায় না। ভূষণের কড়া হুকুম। ঝি চাকরের জিম্মায় বাড়ি ফেলে রেখে যেন কোথাও বেরোনো না হয়।

স্বাভাবিক। ঝি-চাকরদের দিয়ে বিশ্বাস নেই কিছু। চুরি-টুরি হয়ে যেতে কতক্ষণ।

হ্যাঁ, সুদাম চিন্তা করল, তবে যদি শোভা নীচে ওই বৌটার কাছে এসে থাকে।

সুদামের পা ধরে যাচ্ছিল।

একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে সময় কাটতে লাগল। ওপরে যেতে পারছে না সে, আবার এখান থেকে এমনি বাড়ি ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। একবার অন্তত ওই মুখটা সে দেখে যেতে চায়। এক নজর দেখলেই সে বুঝতে পারবে ওর মনের অবস্থা।

শোভার মন আজ কেমন আছে সুদামের তা জানা দরকার। এই জানার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ভবিষ্যতে এবাড়ি আসা-না-আসা, কাল থেকে শোভার কথা চিন্তা করা-না-করা বা ওই মুখটা মনে রাখা-না-রাখা—অনেক কিছু নির্ভর করছে আজ ওই মেয়েকে দেখে যাওয়া বুঝে যাওয়ার ওপর।

তাই সুদাম কেমন হতাশ হল একবারও ভূষণ পোদ্দারের মেয়েকে দেখতে পাওয়া গেল না বলে।

তবে কি সুদাম বাড়ি ফিরে যাবে।

গিয়ে কি করবে?

তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই যেন নেই। বাড়ি গিয়ে এক মুঠো ভাত সে মুখে তুলতে পারবে না। রাত্রে ঘুমোতে পারবে না। চোখের ঘুম চলে গেছে।

আবার তার ইচ্ছা করছিল এক ছুটে ওপরে চলে গিয়ে শোভাকে খুঁজে বার করে। হয়তো ইচ্ছা করে মেয়েটা রান্নাঘরে বাথরুমে কি শোবার ঘরের আনাচে কানাচে লুকিয়ে রয়েছে। ভাঁড়ার ঘরেও থাকতে পারে। রাস্তা থেকে তো আর বাড়ির ভিতরের সব জায়গা দেখা যায় না। যদি একবার ওকে খুঁজে বার করতে পারে সুদাম তখন তাকে কি প্রশ্ন করবে ভাবতে লাগল।

কিন্তু যদি কোন প্রশ্নের উত্তর না দেয় ও?

যদি ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?

কথাটা চিন্তা করে সুদাম নূতন করে বিব্রতবোধ করতে লাগল। তার কপাল ঘামছিল। সেদিন যদি এমন কাটা কাটা কথা বলে মেয়েটা তাকে অপমান করতে পারে আজ চুপ থেকে নাক চোখ কুঁচকে যে ও ঘৃণা করবে না তাই বা কে জানে। এবং এই নীরব ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য সুদামের আরো বেশী লাগবে। হয়তো সে সহ্য করতে পারবে না। হয়তো তখনি ভীষণ রেগে গিয়ে ওর মাথাটা সে দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে দিতে চাইবে।

কিন্তু সেরকম কিছু করার ইচ্ছা তার নেই।

করতে গেলে একটা বিশ্রী ব্যাপার দাঁড়াতে পারে।

কেননা সে বুঝতে পারছে, ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও যে মেয়ে তাকে অপমান করে ঘৃণা করে সে যে পরে অন্যভাবে শত্রুতা করবে না তার বিশ্বাস কি। হয়তো বাপের কাছে যা তা লাগাবে। খালি বাড়ি পেয়ে সুদাম তার গায়ে হাত দিয়েছে তার ওপর অত্যাচার করেছে তাকে অপমান করেছে—কত কিছু বলা সম্ভব। এবং তখন থানা পুলিস আদালত অনেক কিছু হাঙ্গামা বেধে যেতে পারে।

চিন্তা করে সুদাম তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। না, এখন ওপরে যাওয়া হবে না। শোভাকে যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন এই অবস্থায় বাড়ির ভিতর ছুটে গিয়ে ওকে খুঁজে বার করার লোভ সে ত্যাগ করল।

'এই।'

সুদাম চমকে উঠে কান খাড়া করে ধরল।

একটা হিস্ হিস্ শব্দ। তাকে কেউ ডাকছে সে বুঝল। কিন্তু কোন্‌দিক থেকে শব্দটা হচ্ছে সে বুঝতে পারল না। ডাইনে তাকাল বাঁয়ে তাকাল পিছনে তাকাল সে। কিছু চোখে পড়ল না তার। সারি সারি ঘর বাড়ি দরজা জানালার জটলা নিয়ে নির্জন অন্ধকার গলির এলোমেলো ঝাপসা চেহারাটা কেবল তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তবে বুঝি ওপর থেকে শব্দটা আসছে। ভেবে

তৎক্ষণাৎ চোখ তুলে সে ভূষণ পোদ্দারের দোতলা ঘরটার দিকে তাকাল। না, সেখান থেকেও কেউ তাকে হিস্ হিস্ শব্দ করে ডাকছে না।

'এই যে।' সুদামের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবার কেউ যেন আর একটু স্পষ্ট গলায় তাকে ডাকল।

এখন সুদাম মানুষটাকে দেখল।

তার চোখের সামনে—ভূষণ পোদ্দারের বাড়ির পিছনের সেই ছোট দরজার চৌকাঠ ধরে একজন দাঁড়িয়ে আছে। হিস্ হিস্ শব্দ করছে, হাত নেড়ে ইশারা করছে। সুদাম পরিষ্কার হাত নাড়া দেখতে পেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে অবাক হল নিজের বোকামির কথা ভেবে। সামনের দিকে না তাকিয়ে সে পিছনে দেখছিল ডাইনে বাঁয়ে তাকাচ্ছিল ঘাড় তুলে দোতলার ঘর দেখছিল।

সুদাম ও দরজায় দাঁড়ানো মূর্তির মধ্যে ঠিক এক পায়ের ব্যবধান। পা বাড়িয়ে দিয়ে সুদাম সেই ব্যবধানটুকু অতিক্রম করল।

'আমায় ডাকছেন ?'

'হ্যাঁ।' চাপা গলায় বিমলা হাসল। ভূষণ পোদ্দারের বাড়ির নীচের ভাড়াটেদের বৌ, সুদাম চিনতে পারল। 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?' বিমলা শুধাল।

'না, এই এমনি।' মিনমিনে গলায় সুদাম কথা বলল। 'ওপরে কেউ নেই মনে হচ্ছে—'

'আছে।' তেমনি চাপা গলায় বিমলা হাসল। 'রান্নাঘরে আছে। ঝিয়ের অসুখ করেছে, শোভাকে রাঁধতে হচ্ছে।'

'ভেতরে এসো—রাস্তায় কতক্ষণ দাঁড়াবে।' বিমলা দরজার আর একটা পাল্লা খুলে দিল। এতক্ষণ ওটা ভেজানো ছিল। একটা পাল্লা খুলে রেখে ও দাঁড়িয়ে সুদামকে দেখছিল।

'তা হলে আপনি ওকে একবার বলুন।' যেন তখনও ইতস্তত করছিল সুদাম। 'আমি না হয় এখানে—'

'আচ্ছা—তুমি ভেতরে এসো।'

পথ ছেড়ে দিয়ে বিমলা চৌকাঠের এক পাশে দাঁড়াল। সুদাম চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ভিতরে ঢুকল। বিমলা এবার দরজার দুটো পাল্লাই ভেজিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'এসো।'

সুদাম দোতলার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল। বিমলা বাধা দিল।

'এখন না, হাত মুখ ধুয়ে ও ঘরে আসুক—কাপড় টাপড় বদলাবে। ততক্ষণ তুমি এঘরে এসে বসো।' সিঁড়ির পাশের ছোট একটা ঘরের দরজার ভেজানো পাল্লা দুটো ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল বিমলা। 'এসো।'

সুদাম আপত্তি না করে বিমলার পিছু পিছু সেই ঘরে ঢুকল। ভিতরে আলো জ্বলছিল। মোটামুটি রকম সাজানো গোছানো ঘর। বেশ পরিচ্ছন্ন। একতলার ঘর বলে বাইরে থেকে যা একটু নোংরা মনে হয়।

একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিল বিমলা।

'বসো।'

সুদাম বসল। বিমলা বসল না। সুদামের মুখোমুখি ঠায় একটা টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল।

'সেই সন্ধ্যা থেকে রাঁধছে। অভ্যাস নেই তো। কাজেই দেরি হচ্ছে—কুলিয়ে উঠতে পারছে না মেয়ে।'

'আপনি ওপরে গিয়েছিলেন বুঝি?' বিমলাকে এত কাছে এত স্পষ্ট করে সুদাম আর দেখেনি. মাঝে মাঝে ওপরে দেখেছে—খুব অল্প সময়ের জন্য—দূর থেকে। শোভার সঙ্গে বসে হয়তো গল্প করছিল। সুদাম ভিতরে ঢুকল তো বিমলা বেরিয়ে গেল।

শোভার কথা হচ্ছিল, শোভার কথা শুনছিল সে। কিন্তু তা হলেও একটু বেশী সময়—কেমন যেন হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সুদাম নীচের বৌটাকে দেখতে লাগল। এত সুন্দর নাক চোখ ভুরু চুল গায়ের রং। হেসে হেসে কথা বলছে। ফুলের পাপড়ির মতন

পাতলা ঠোঁট। দাঁতগুলি যেন দাঁত না। এক জাতের দামী পাথর। এমন সুন্দর দাঁত মানুষের থাকে সুদামের জানা ছিল না।

'অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলে তাই না?'

সুদাম ঘাড় নাড়ল।

'দেখে এমন খারাপ লাগছিল।' বিমলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরাল। যেন একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলল সুদামের মনে হল। বৌটা আর তার দিকে তাকিয়ে নেই বলে সুদাম আরো ভাল করে আরো গভীর দৃষ্টি দিয়ে মানুষটাকে দেখতে লাগল। এখন আর মুখ দেখছে না সে। কাঁধ দেখছে বুক দেখছে। সুঠাম কোমর, সুবলিত হাত হাতের আঙুল নখ।

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছ দেখে আমার খারাপ লাগছিল। সেদিনের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল কিনা।'

সুদাম চমকে উঠল। বৌটি তার চোখের দিকে টলটল করে তাকিয়ে আছে।

'কোন্ কথাটা বলুন তো?' সুদাম একটা ঢোক গিলল।

'ও, তুমি তা হলে ভুলে গেছ। যাক ভুলতে পেরেছ যে রক্ষে! আমি ভাবলাম, কি জানি, সেদিনের কথা ভেবে বুঝি বাড়ির দরজায় এসেও দোতলায় উঠতে পারছিলে না। মনের সায় পাচ্ছিলে না।'

এখন সুদাম বুঝল। তাই অল্প হাসল।

'আপনি কি শুনেছিলেন? আপনি তো সেখানে ছিলেন না তখন?'

'আড়ি পেতে শুনেছি বৈকি। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি।'

সুদামের কান দুটো হঠাৎ লাল হয়ে উঠল।

বিমলা একদৃষ্টে ছেলেটাকে দেখছিল।

'ব্লাউজ এনেছ? দেখতে পাচ্ছি না তো?'

সুদাম মাথা নাড়ল।

বিমলা আবার অন্যদিকে চোখ ফেরাল। কিন্তু এবার সুদাম চোখ তুলতে পারছিল না। মুখ গুঁজে নিজের পায়ের চটি দেখছিল।

'ছি ছি! এমন করে মানুষ কথা বলে! এ ভাবে কেউ কাউকে আঘাত করে!' বিমলা বলছিল। সুদাম শুনছিল। 'আমি পরে ওকে খুব বকেছি। যা তা বলেছি। তুই যেমন ছেলেমানুষ সে-ও ছেলেমানুষ। এখনি চাকরি বাকরি রুজি রোজগারে নেমে যাবে আশা করছিস কেন। কচি বয়েস। এখন কেবল স্বপ্ন দেখছে রং চাইছে। আর এখন থেকে যদি ঘরে পা দিতে না দিতে এটা দাও ওটা দাও বলে বায়না করতে শুরু করিস তো তোদের ভালবাসার সুতো ছিঁড়ে যেতে কতক্ষণ!'

সুদাম তেমনি চুপ।

বিমলা আর একটু কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল।

'কেমন, ভাল বলিনি?'

সুদাম চোখ তুলল। তার চোখ ছলছল করছে সে নিজেও টের পেল। হাতের পিঠ দিয়ে সে চোখটা মুছে ফেলল।

'এত দুঃখ পেয়েছিলাম সেদিন—' যেন এর বেশী বলতে পারল না সুদাম।

'আমি বুঝেছি, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার মুখখানা কেমন শুকিয়ে গেল আমি কি সেদিন লক্ষ্য করিনি। আমার এত খারাপ লাগছিল।

'থাক তুমি মন খারাপ করো না।' বিমলা সুদামের একটা হাত ধরল। হাত ধরে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'আমি বুঝিয়ে বলেছি—যখন রোজগার করবার ঠিকই করবে। যখন শাড়ি ব্লাউজ সাবান পাউডার দেবার ঠিকই এনে দেবে—'

'আমার মনে হয় ও একটু স্বার্থপর'—সুদামের ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। বৌটির ফুলের পাপড়ির মতন পাতলা ঠোঁট দুটো দেখতে দেখতে সে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'একটু না—বেশ স্বার্থপর।' সুদাম একটু অবাক হল প্রথমটায়, কিন্তু তারপর আর হল না। কথা বলতে বলতে বৌটি তার হাতের আঙুল কটাও মুঠোর মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিচ্ছিল। স্বাভাবিক। সুদাম ভাবল। মেয়েদের মন খুব নরম। মমতায় ভরা। আর একটি মেয়ে তাকে আঘাত দিয়েছে দেখে এই মেয়েটির মনে ভীষণ লেগেছে। তাই সে তাকে আদর করছে স্নেহ করছে। তা না হলে এমন করে তার হাত ধরবে কেন, আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করবে কেন! 'আমি তো শোভাকে সারাদিন দেখছি—বাপ সোনা রূপার ব্যবসা করে। টাকা কড়ি ছাড়া সংসারে অন্য কিছু চেনে না। মেয়েও তাই হয়েছে। এটা চাই ওটা চাই। স্বার্থপর —ভীষণ স্বার্থপর।' বৌটি চুপ করল। কিন্তু সুদামের হাত ছাড়ল না।

'আমার আর ইচ্ছা করে না একদিনও ওপরে যাই।' কেমন যেন হতাশ ভাঙ্গা গলায় সুদাম বলল, 'হয়তো আর যাবই না।'

বিমলা তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না।

সুদাম তখন তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখছিল।

'বাড়িতে কেউ নেই মনে হয়?'

এবার সুদামের হাতটা ছেড়ে দিল ও।

এতক্ষণ মাথায় কাপড় ছিল। এবার ও কাপড়টা সরিয়ে দিল। কালো চকচকে বিশাল খোঁপা ও ফর্সা টুকটুকে ছুটো কান এখন ভাল করে দেখতে পেল সুদাম। এতক্ষণ ভীষণ বৌ বৌ লাগছিল-- মাথার কাপড় ফেলে দিতে সুদামের মনে হল তার বোন টগরের মতন, ভূষণ পোদ্দারের মেয়ে শোভার মতন আর একটি মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আর এই মেয়েটার সঙ্গে 'আপনি' 'আপনি' করে সে কেন কথা বলছিল ভেবে অবাক হল।

'না, এসময় বাড়িতে কেউ থাকে না। সবাই বাইরে। শাশুড়ী

আর আমি আছি। তাও তো উনি অসুস্থ বলে সারাক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমোন। এখনো দেখে এলাম ঘুমোচ্ছেন।'

'পাশের ঘরে আছেন?' হঠাৎ কেমন চাপা গলায় প্রশ্ন করল সুদাম।

বিমলা মাথা নাড়ল।

'এটা আপনার ঘর?' ইচ্ছা থাকলেও সুদাম তুমি বলতে পারল না। 'আপনারা দুজন থাকেন এঘরে?'

বিমলা ঠোঁট টিপে হাসল।

'দেখে বুঝতে পারছ না!'

'তা বুঝেছি।' সুদাম ঠোঁট টিপে হাসল। খাটের ওপর ধবধবে বিছানা, পাশাপাশি দু' জোড়া বালিশ। আলনায় শাড়ি সায়ার পাশে একটি পুরুষের জামা কাপড়। পুরুষের চটির পাশে জরির কাজ করা এক জোড়া মেয়েলী চটি। 'ভেতরে পা দিয়েই বুঝেছি আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর এই ঘর।' যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে শেষ করে সুদাম বৌটির চোখের দিকে তাকাল।

'ভাল লাগছে আমার ঘরটা দেখে?' বিমলা আবার তার হাত ধরল।

সুদাম মাথা নাড়ল।

'মনে হয় খুব শান্তির জীবন আপনাদের।'

'তোমার কি তাই মনে হয়?'

'এত ভাল লাগছে ঘরটা!' কেমন যেন লোভীর মতন সুদাম আড়চোখে খাটের বিছানাটা দেখতে লাগল। বার বার সে বিছানাটা দেখছে বিমলা লক্ষ্য করছিল।

'মাঝে মাঝে এসো--এসময়টা কেউ বাড়ি থাকে না।'

সুদাম ঘাড় কাত করল।

'আজ কি ওপরে যাব?'

'ইচ্ছা করছে না যখন তোমার গিয়ে কাজ কি।'

'তবে থাক।' একটু চুপ থেকে সুদাম বলল, 'মনে হয় এখন ওর রান্না শেষ হয়েছে।'

'মনে হয় না।' বিমলা মাথা নাড়ল। 'কাজকর্ম কিছু জানে না। কেবল সেজেগুজে থাকতে চায়।'

সুদাম চুপ করে ছিল।

'এমন মেয়ে যদি ঘরের বৌ হয়ে আসে তবেই হয়েছে আর কি।' বিমলা যেন নিজের মনে কথা বলল।

ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। সুদাম চমকে উঠল। ওপাশটায় না এপাশটায় শব্দ হচ্ছে। এধারের একটা ঘরে। সুদাম বিমলার দিকে চোখ ফেরাল।

'দোকান ঘরে শব্দ হচ্ছে। ভূষণ পোদ্দারের কারিগরেরা কাজ করছে।' বিমলা আস্তে বলল।

'ও!' সুদাম এতক্ষণ ঠিক করতে পারছিল না ভূষণ পোদ্দারের দোকানটা কোন্‌দিকে। এখন বুঝতে পারল। 'ওদিকটাই তা হলে বাড়ির সদর। আপনার ঘরটা দোকান ঘরের সঙ্গেই।'

'হুঁ।' বিমলা মাথা নাড়ল। 'অনেক রাত পর্যন্ত ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হয়। কারিগরেরা কাজ করে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে শুনি।'

'ওটা ওদের পিছনের দরজা?' সুদাম আঙুল দিয়ে পাশের দরজাটা দেখাল। 'তাই না?'

'হুঁ—কোনদিন খোলা হয় না ওই দরজা। ওদিক থেকে ডবল তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'গহনার দোকান।' সুদাম বিড়বিড় করে বলল। হঠাৎ তাদের পাড়ার সি. সরকারের প্রকাণ্ড জুয়েলারী দোকানটা তার মনে পড়ল। এবং সেই সঙ্গে আরো অনেক কথা মনে পড়ল। তপার মুখ ভল্টুর মুখ মনে পড়ল। বিকেলে তেঁতুলতলার আড্ডায় বসে তিনজন কি নিয়ে আলোচনা করছিল সব তার মনে পড়ল।

'চুপ করে আছ কেন?'

'না, ভাবছি এখন উঠতে হয়।' ভূষণ পোদ্দারের দোকানের তালা লাগান পিছনের দরজার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনল সুদাম। 'রাত হল।'

'আর একটু বসো।'

'উনি এখন ফিরবেন না ?'

'কে ? আমার স্বামী ?' বিমলা অল্প একটু হাসল। 'তা ফিরলেনই বা। বলব, ওপরের শোভনার প্রেমিক।'

'ধ্যেৎ !' সুদাম হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। অল্প হাসিতেও বিমলার গালে টোল পড়ে। সুদাম ইতিমধ্যে দুবার লক্ষ্য করেছে। 'না, আমার ভীষণ লজ্জা করবে তাঁর সামনে এ সব বললে।'

'আহা, তুমি মেয়েছেলে। লজ্জা করবে !' বলতে বলতে চোখের পলকে বিমলা সুদামের গালে হাত রাখল ও গালটা টিপে দিল। স্তব্ধ হয়ে গেল সে। মেরুদাঁড়ায় বিদ্যুৎ শিহরণ অনুভব করল। বিমলা এবার দু গালে দুটো টোল ফেলে হাসছে। যেন হেসে তাকে অভয় দিচ্ছে। 'পুরুষই তো প্রেম করে—পুরুষ মেয়েকে ভালবাসে—মনের মতন একটি মেয়েকে কাছে পেতে চায়। তাতে আবার লজ্জা কি।'

সুদাম ঢোক গিলছিল ও বৌটির গালের টোল দেখতে দেখতে কথাগুলি শুনছিল।

'অবশ্য শোভা তোমার মনের মতন মেয়ে হতে পারে না এটা আমি সেদিনই বুঝে গেছি—কিন্তু তা বলে তোমার তো কোন দোষ নেই। তোমার প্রেম খাঁটি ছিল—তোমার ভালবাসায় খুঁত ছিল যদ্দূর মনে হয়।'

সুদামের ঠাকুমা একটা কথা বলেন—ছাইয়ে জল ঢালা। বিমলার কথা শুনে সুদামের মনে হল সে-ও ছাইয়ে জল ঢেলে এসেছে। শোভাকে খামকা সে এতদিন ভালবেসে এসেছে। কোন

ফল হল না। যেন আর কোথাও এই ভালবাসার জল ছিটোলে অনেক বেশী কাজ হত।

'আমি আজ চলি।'

'তবে আর একদিন এসো।'

সুদাম ঘাড় তুলতে পারছিল না। মুখ নীচের দিকে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কেননা তার দু চোখ আবার ছলছল করছে। চোখের জলটা বৌটাকে দেখাতে তার লজ্জা করছিল। আবার হয়তো কাপুরুষ টাপুরুষ বলবে। অবশ্য সুদাম মনে মনে এই আশাও করছিল এবার তার চোখে জল দেখলে বৌটি—নিজের হাতে সেই জল মুছে দিত। হ্যাঁ, এমন মমতা এত দয়া সে ঐ মানুষটির মধ্যে দেখেছে। অথচ মোটে একদিনের আলাপ। রাস্তায় নেমে তার আফসোস হচ্ছিল আর একটু সময় বসে এলে ক্ষতি ছিল কি।

সি. সরকারের জুয়েলারী দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তার ওপারে হারান মুদীর দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন একরকম নেই বললে চলে।

বেশ রাত করে ফেলেছে সুদাম শ্যামবাজার থেকে ফিরতে। অবশ্য মোড়ের সেই চায়ের দোকানে ঢুকে সে আবার এক কাপ চা খেয়ে নিয়েছে। তখন চা-টা সে খেতে পারেনি। দ্বিতীয়বার দোকানে ঢুকে বাজে বখাটে ছোঁড়াগুলোকে সুদাম আর দেখতে পায়নি। চায়ের দোকান ছেড়ে অন্য কোথাও তারা আড্ডা দিতে গেছে। ওদের আড্ডা দেবার জায়গার অভাব হয় না। দোকানটা তখন একেবারে ফাঁকা ছিল। সুদাম নিশ্চিন্ত মনে বসে চা খেয়েছে। তার মনের ভার কেটে গিয়েছিল।

ভিতরে ভিতরে একটা নূতন শক্তি, অন্যরকম উত্তেজনা অনুভব করছিল সে।

সারাদিন তার মন খারাপ ছিল।

মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে সে ভীষণ একা।

তার দিকে তাকাতে তাকে ভালবাসতে—তার চোখের জল দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে এই সংসারে একজনও নেই।

সবাই যার যার স্বার্থ নিয়ে আছে।

ঠাকুমা তাকিয়ে আছে কবে সে মানুষ হবে টাকা-পয়সা ঘরে আনবে। টগর তাকিয়ে আছে কবে দাদা একটা কাজে ঢুকে এদিকের খরচ চালিয়ে ওদিকে ওর বিয়ের জন্য বাবার জমানো টাকাটা কাজে লাগাবে। তপা, ভলটু তার বন্ধু। কিন্তু তারাও স্বার্থের বন্ধু। ওপর ওপর বন্ধু। আজ যদি সুদাম অসুস্থ হয়ে একমাস বিছানায় শুয়ে থাকে ওরা একবেলা তাকে দেখতে যাবে না। অসুখ সেরে তেঁতুলতলার আড্ডায় গিয়ে যেদিন সে আবার বসবে সেদিন তারা 'কেমন আছিস' 'কি হয়েছিল' ইত্যাদি দুটো একটা যদি ভাল মন্দ প্রশ্ন করে ও একটু সহানুভূতি দেখায়। অর্থাৎ তারা কেবল তেঁতুলতলারই বন্ধু।

কাজেই সুদামের মনে হচ্ছিল সে বড় অসহায়—বড় একলা হয়ে এই সংসারে বেঁচে আছে।

একজন ছিল যাকে সে সত্যিকারের আপনজন বলে ভাবতে পারত—আত্মীয় বন্ধুরা যা করে না দেখে না সে তা করবে দেখবে।

কিন্তু পরশু রাত্রে সুদাম সেই মানুষটির মনের পরিচয় পেয়ে এসেছে। স্বার্থ নিয়ে বসে আছে।

এসব ভেবে সুদামের মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু শ্যামবাজার ঘুরে আসার পর—ভূষণ পোদ্দারের বাড়ির একতলার ভাড়াটেদের সেই বৌটির সঙ্গে কথা বলে আসার পর থেকে সুদামের মনে হচ্ছিল না, পৃথিবীটা কেবলই স্বার্থপর মানুষে ভরা। এমনও

দুটি একটি মানুষ আছে, অপরের দুঃখে যাদের মন কাঁদে, পরের জন্য যারা ভাবে।

একটানা বাদলার পর হঠাৎ একদিন রোদ উঠলে আকাশ মাটি গাছপালা যেমন ঝলমল করে ওঠে সুদামের মনটাও তেমনি আলোয় আলোয় ভরে উঠল।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে গুনগুনিয়ে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সে পথ চলছিল।

চায়ের দোকানে ও ট্রাম বাস-এ খরচ করে তখনও একটা দশ নয়া তার পকেটে ছিল। একটা ভিক্ষুককে সেটা দিয়ে দিল সে।

কোনদিন সে ভিক্ষুককে পয়সা দেয় না।

কিন্তু আজ তার মনে হচ্ছিল পরের উপকার করা ভাল। তাতে নিজের উপকার হয়। কেবল স্বার্থ নিয়ে বেঁচে থাকলে দুঃখ পেতে হয়। শোভা দুঃখ পাবে। শোভার বাবা ভূষণ পোদ্দার কি কম স্বার্থপর। একটা জঘন্য স্বার্থ বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখে এবাড়ি আসা-যাওয়া করছে। কাজেই ও ব্যাটার কপালেও অশেষ দুঃখ আছে। দুঃখ পাচ্ছে সুদামের ঠাকুমা। কেননা স্বার্থ ছাড়া কথা নেই বুড়ীর। তাই বাহাত্তুরে বুড়ি বিছানায় শুয়ে রাতদিন কেবল হাঁপাচ্ছে—এত কাঁদাকাটা করেও যমের দেখা পাচ্ছে না। টগরের কপালেও দুঃখ আছে। ওই মেয়েও কম স্বার্থপর নয়। আর তপা ও ভল্টু—দুঃখের হাত থেকে ওরা রেহাই পাবে না, সুদাম মনে মনে বলল, বন্ধুর বেশে স্বার্থপরের দল আমাকে ঘিরে আছে।

কিন্তু সুখে থাকবে ওই মেয়েটি—ভূষণ পোদ্দারের বাড়ির একতলার বৌটি। স্বার্থের ছিঁটেফোঁটা মানুষটার মধ্যে নেই। এত দরদ এমন মমতা সুদাম আর কোন মানুষের মধ্যে দেখেছে মনে করতে পারল না।

বৌটির কালো চোখ দুটি সুদামের চোখের সামনে ভাসছিল। দৃষ্টিটা কত ঠাণ্ডা কত নরম।

নরম ঠাণ্ডা কালো দৃষ্টির কথা চিন্তা করতে করতে সে একসময় হারান মুদীর দোকানের পিছনে তেঁতুলতলায় চলে এল। বাড়ি ফিরতে তার ভাল লাগছিল না।

বাড়িতে আমার কেউ নেই। মনে মনে বলল সে। যারা আছে তারা ওবাড়ির শোভার মতন তাকিয়ে আছে, কবে আমি টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করব। অর্থাৎ তারা চাইছে এখন থেকেই আমি একটা কাজে-টাজে ঢুকে পড়ি। তবেই আমি তাদের চোখে মানুষ হব। এখন আমি অমানুষ। পশু।

আর ওই বৌটি বলছে, এখনই সে কাজে ঢুকবে কোন্ দুঃখে। এখন তো কেবল স্বপ্ন দেখার রং দেখার বয়স।

প্যাকিং বাক্সগুলিকে তক্তাপোশের মতন করে সাজিয়ে নিয়ে সুদাম টান হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুটঘুটে অন্ধকার নিয়ে তেঁতুলতলাটা কেমন ছমছম করছিল। অন্ধকার ও গাঢ় নির্জনতা তার ভাল লাগছিল।

এখন সে চমৎকার কল্পনা করতে পারছিল পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গেছে শ্মশান হয়ে গেছে। মানুষ পশুপক্ষী পোকামাকড় কিছুই নেই। বেঁচে আছে শুধু তারা দুজন। সুদাম আর সেই বৌটি।

আশ্চর্য, অন্ধকারে শুয়ে থেকে সুদাম কিন্তু বৌটির নরম মন মায়ায় ভরা হৃদয়ের কথা আর চিন্তা করল না।

সুন্দর শরীরটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। কোমর পিঠ গলা কাঁধ চিবুক ফর্সা টুকটুকে দুখানা হাত। মাথার কাপড় সরে গেছে। এই তেঁতুলতলার জমাট অন্ধকারের মতন মিশমিশে কালো বিশাল খোঁপাটা সুদাম পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

সুদাম চোখ বুজল।

যেন গাছতলার অন্ধকার যথেষ্ট না।

আরো অন্ধকার চাইছে সে।

যত বেশী অন্ধকার হবে তত খুঁটিয়ে সে ওই শরীরটা দেখবে।

আজ পর্যন্ত কোন কিশোরী কোন যুবতী তার আঙুল নিয়ে এমনভাবে খেলা করেছে কি। চিন্তা করে সুদামের বুকের ভিতর তুরতুর করতে লাগল। যেন একটা রেলগাড়ি যাচ্ছিল সেখানে। তার হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল, রক্তে শব্দ হচ্ছিল।

রক্তের সেই শ্রুতিমধুর শব্দ শুনতে শুনতে সুদাম গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব খারাপ কাটল পরদিন সকালবেলাটা সুদামের। স্বাভাবিক।

ঠাকুমা রাগারাগি করল। টগর আরো বেশী গম্ভীর হয়ে আছে। কটা দিন ধরেই এমন যাচ্ছে। কথা বলবে দূরে থাক দাদার দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত ও। আর কাল কিনা সুদাম বাইরে কোথায় না কোথায় রাত কাটিয়ে এল।

উচ্ছন্নে যাবার আর বাকী রইল কী।

খুব চেঁচামেচি করছিল বলে সুদাম ধমক দিয়ে বুড়ীকে যদি থামিয়ে দিতে গেছে বুড়ী হাউমাউ কাঁদাকাটি করে বাড়ি মাথায় তুলল।

অথচ সুদামের মাথা খুব ঠাণ্ডা ছিল।

তার বুকের সব জ্বালা-যন্ত্রণা চলে গিয়েছিল কাল সন্ধ্যা থেকে। ভেবেছিল বাড়ি ফিরে চা খেয়ে ডাইং ক্লিনিং থেকে আগে শার্ট প্যাণ্টটা নিয়ে আসবে। তারপর দাড়ি কামাবে। তারপর জুতোটায়

বুরুশ লাগাবে। এবং মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল স্নান করে খেয়ে তুপুরে বেশ করে খানিকটা ঘুমিয়ে নেবে। না, বিকেলে তপাদের আড্ডায় যাওয়া হবে না। একলা সে কোথাও একটা পার্কেটার্কে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবে। তারপর সন্ধ্যাবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামবাজারের ট্রামে চাপবে।

কিন্তু বাড়িতে এত অশান্তি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে সে কি জানত।

অন্যদিন কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে টগর উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দেয়। কিন্তু আজ এতটা বেলা পর্যন্ত উনুন ধরছে না দেখে সুদামের মাথা আরো গরম হয়ে উঠল।

'দাঁড়াও!' নিজের ঘরে বসে সুদাম দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল! 'ওই তুটোকেই একসঙ্গে কেটে টুকরো টুকরো করে আমি যদি শেষ না করছি একদিন তো আমার নাম সুদাম দত্ত না। খুব বাড় হয়েছে তুজনের।'

ওদিকে টগর গজ্‌গজ্‌ করছিল। যেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুদামকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল, 'কয়লা নেই, চা নেই, চিনি নেই—বাবু চা চা করছেন—লজ্জা করে না—অকর্মার ঢেঁকি হয়ে কি করে বাড়িতে মুখ দেখায়—বাইরে মুখ দেখায়—'

সুদামের আর সহ্য হল না। এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে টগরের চুলের ঝুটি ধরে এমন জোরে টান মারল যে টগর ছিটকে সিমেন্টের ওপর পড়ে গেল। কপালে লাগল। কপাল কেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে আরম্ভ করল।

শুয়ে থেকে বুড়ী ও-ঘর থেকে সব দেখছিল।

ভয়ে আর কথা বলছিল না। কেননা সুদামের চোখ মুখের তখন এমন সাংঘাতিক চেহারা হয়েছে যে বুড়ী বেশ বুঝতে পারছিল টুঁ শব্দটি করলে দস্যু তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হয়তো এমন জোরে কিলঘুষি বসাবে যে তাতেই বুড়ীর মৃত্যু ঘটবে।

অপমৃত্যু। অপমৃত্যুকে বুড়ী ভীষণ ভয় করে। তার চেয়ে চুপ থাকা ভাল। চুপ থেকে বুড়ী ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল।

টগর তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। যেন চিৎকার করে কাঁদতে তারও ভয় হচ্ছিল। উঠে চুল ঠিক করে কাটা কপালটা চেপে ধরে কলতলার দিকে চলে গেল।

সুদাম ভেবেছিল একটা ভীষণ হৈ-চৈ হবে—হল্লা চিৎকার শুনে পড়শীরা ছুটে আসবে, পাড়ার লোক ছুটে আসবে। তারপর সুদামের বিচার আরম্ভ হবে। মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা—ভদ্রপাড়ায় থেকে—

কিন্তু সেসব কিছুই ঘটতে দেখল না সে। বাড়ি যেমন চুপচাপ ছিল তেমনি থেকে গেল। একটা কাক চৌবাচ্চার কাছে বসে কা কা করছিল। সুদামের আর ইচ্ছা হল না টগরকে চায়ের জন্য তাড়া দিতে। তার একটু কষ্ট হতে লাগল। এমন করে টগরের চুল ধরে টান দেওয়া উচিত হয়নি। শত হলেও তার ছোট বোন। কিন্তু কী আর করা! রাগ সামলাতে পারেনি সে। একটু বেলা হোক। টগরকে সে বুঝিয়ে বলবে।

সুদাম নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

অগত্যা নিধুর চায়ের দোকানে গিয়ে এখন চা খেয়ে আসা ঠিক করল সে। ধারে খেতে হবে। কিন্তু এত সকালে ধার দেবে কি? যদি বউনি হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় দেবে। কেননা সুদাম বড় একটা ধারটার খায় না। এদিক দিয়ে তার সুনাম আছে। আর যদি বা মাঝে মধ্যে খায় তবে সেদিনই কি পরদিন পয়সাটা দিয়ে দেয়। যদি এখন সে ধারে খায় তো বিকেলের মধ্যে পয়সাটা দিয়ে দেবে। কেননা এর মধ্যে তো তাকে বাজার টাজার করতে হবে। কাজেই কিছু খুচরা পয়সা তার হাতে এসে যাবে।

চিন্তা করতে করতে সুদাম আলনা থেকে শার্টটা নিয়ে গায়ে চড়াতে যাবে এমন সময় তপা এসে জানলায় উঁকি দিল।

'কি খবর!' খুব একটা প্রসন্ন হল না বন্ধুকে দেখে, তা হলেও কথা না বলে পারল না সুদাম।

'ভয়ানক প্রাইভেট কথা আছে তোর সঙ্গে।' তপা ফিসফিসে গলায় বলল, 'কোথাও বেরোচ্ছিস নাকি?'

'না।' সুদাম মিথ্যা বলল। কেননা চা খেতে যাচ্ছে শুনলে তপা সঙ্গ নেবে। আর তখন বন্ধুকে দোকানে বসিয়ে রেখে সুদাম একলা কিছু চা খেতে পারবে না। আবার তপার পকেট থেকে একটা নয়া পয়সাও যে গলান যাবে না সে সম্পর্কে সুদাম নিশ্চিন্ত ছিল।

সুদাম বেরোচ্ছে না শুনে তপা হুট করে ঘরে এসে ঢুকল। তার হাতে কাগজে মোড়া কি একটা দ্রব্য।

ভিতরে ঢুকে কোন কথা বলার আগে তপা দরজাটা ভেজিয়ে দিল। সুদাম একটু অবাক হল।

'কি ওটা?'

'চুপ!' তপা আবার ফিসফিস করে উঠল। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল তার। যেন ভয় উত্তেজনা দুটোই তার চোখে মুখে ফুটে উঠছিল। তার হাত কাঁপছিল।

সুদাম চুপ করে ছিল।

মোড়কটা খুলে ফেলল তপা।

'চিনিস এটা?'

সুদাম মাথা নাড়ল। এই জিনিস সে আর কোনদিন দেখেনি।

'সিঁদ-কাঠি।' তপা হাতের যন্ত্রটাকে সুদামের চোখের সামনে তুলে ধরল। একটা লোহার ডাণ্ডা। এক হাত সোয়া হাতের বেশী লম্বা হবে না। এক দিকের মাথা বর্শার মতন ছুঁচালো। আর একটা মাথা চেপ্টা এবং কাস্তের ফলার মতন বাঁকানো। কিন্তু ভয়ানক ধারালো।

সুদামের চোখ বড় হয়ে গেল।

যেন নিশ্বাস পড়ছিল না তার। একবার তপার মুখ একবার তার হাতের যন্ত্রটা দেখছিল সে।

'কোথায় পেলি ?' এক সময় সে প্রশ্ন করল। কিন্তু তপা তা শুনতে পেল না।

'দরজার দুটো পাল্লার ফাঁকে এমাথাটা ঢুকিয়ে এমনি করে যদি চাড়া দেওয়া যায় তো হুড়্কা-টুড়্কা যাই থাক পট্ করে খুলে যাবে।' তপা বোঝাচ্ছিল, 'হুঁ, আর এমাথাটা হল দেয়ালের ইট সরাবার জন্যে। কেমন মজবুত আর ধার হাত দিয়ে ছাখ্। কংক্রীটের গাঁথুনি থাকলে তা-ও ফাটিয়ে চৌচির করে দেওয়া যায়। না, এক ফোঁটা শব্দ হবে না। কাগজের মতন পর্ পর্ করে খুলে আসবে, সিমেণ্ট কংক্রীট ইট পাথর সব।'

'কোথায় পেলি এই যন্ত্র ?' রুদ্ধশ্বাস সুদাম ফের প্রশ্ন করল।

'বঙ্কুকে চিনিস ?' তপা প্রশ্ন করল।

'ঘোষেদের বঙ্কু তো ?'

'হুঁ' তপা বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়ল। 'স্টেট বাসে কাজ করত শুনেছিলি ?'

'হুঁ' সুদাম মাথা নাড়ল। 'চুরি না ঘুষের দায়ে চাকরিটা চলে যায়। তাই না ?'

'বৌ, চার চারটে বাচ্চা—ভীষণ কষ্টে পড়েছিল লোকটা। খেতে পেত না এমন দিন গেছে বঙ্কুর।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি—এটা ভরসা'—তপা নাকে হাসল। 'এখন তার ঘরে রেডিও, ইলেকট্রিক পাখা—বৌয়ের গায়ে দু তিন পদ সোনার গহনা।'

'বাঃ চমৎকার!' সুদাম এবার নিজের হাতে সিঁদ কাঠিটা তুলে নিল। 'তা এটা তোর কাছে কেন ?'

ভেজানো দরজাটার দিকে চোখ রেখে তপা গম্ভীর হয়ে বলল,

'বঙ্কুকে আমি দাদা ডাকি—বঙ্কুর বৌকে বৌদি ডাকি—আমাদের পাশের বাড়ি তো—একেবারে এইটুকুন থাকতে ওবাড়ি আমার যাওয়া আসা।'

'তাই নাকি ?'

'লোকের সঙ্গে তো আর তেমন মেলামেশা নেই তোর—ঐ যা আমাদের দু একজনের সঙ্গেই মিশিস—' হঠাৎ কেমন একটা নাক সিঁটকাবার মতন চেহারা করল তপা। 'আমি তোর মতন ঘরকুনো নই—পাঁচটা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা জানাশোনা বন্ধুত্ব আছে আমার—বঙ্কুদা আমাকে ভীষণ ভালবাসে আবার বিশ্বাসও করে তেমনি।'

'তোকে এটা দিয়ে দিল বুঝি বঙ্কু ঘোষ ?'

'তোর যেমন বুদ্ধি !' সুদামের হাত থেকে সিঁদ-কাঠিটা কেমন যেন ছিনিয়ে নিল তপা। তারপর সেটা কাগজ দিয়ে আবার ভাল করে মুড়তে লেগে গেল।

তপা চুপ করে রইল।

'এটা এখন তোর কাছে থাকবে।' কাগজে মোড়ান যন্ত্রটা আবার সুদামের হাতে তুলে দিল তপা। 'খুব সাবধানে রাখবি। কেউ যেন জানতে না পায়—দেখে না ফেলে।' ঘরের এদিক ওদিক চোখ বুলোতে থাকে তপা। তারপর এক জায়গায় দৃষ্টিটা স্থির ভাবে ধরে রেখে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। 'ওটার ভেতর কি রেখেছিস —ওই কোণার দিকে ঝুড়িটার মধ্যে ?'

'আমার টেক্‌স্‌ট বইগুলো।' সুদাম কোণের দিকের বেতের ঝুড়িটার দিকে তাকাল। ঝুড়ির চারপাশে মাকড়সার জাল তৈরী হয়েছে।

তপা একগাল হাসল।

'বইগুলো এখনো ধরে রেখেছিস—কেন, আবার কি ইস্কুলের গোয়ালে ঢোকার ইচ্ছা তোর ?'

'ধেৎ।' সুদাম মাথা নাড়ল। 'তুবার কামড় খেয়ে ফিরে এসেছি—সব ব্যাটা মাস্টার জোট বেঁধে আমায় তু তুবার ফেল্ করিয়েছে—আর ওখানে ঢোকে কোন্ শালা।'

'তো ওজন দরে বইগুলো বিক্রি করে দে না—যাক্গে' তপা জরুরী কথায় ফিরে এল। 'ভালই হয়েছে—তোর ওই বইয়ের গাদার মধ্যে এটা ঢুকিয়ে রাখ—কেউ সন্দেহ করবে না।'

'কিন্তু এটা তোর কাছে এল কি করে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' সুদাম বিড়বিড় করতে লাগল। বস্তুত এমন একটা জিনিস নিজের কাছে রাখতেও যেন সে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তপা ভেংচি কাটল।

'তোর সাহসের বলিহারী—তুই-ই না বলছিলি অমুক দোকান লুট করতে আর তমুক ব্যাটাকে অন্ধকার গলিতে জাপটে ধরে ছোরা দেখিয়ে সব কেড়ে ছিনিয়ে নিতে—একটা সিঁদ-কাঠি ঘরে রাখতে আত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে এখন ?'

'আহা—তা বলছি নাকি—বলছিলাম বঙ্কুর কাছ থেকে কি এটা চেয়ে এনেছিস ?'

'না।' গম্ভীর হয়ে তপা বলল, 'বঙ্কুদা একটু অসুবিধায় আছে। ছিদাম মুদী লেনের একটা চুরির ব্যাপারে পুলিস বঙ্কুদাকে সন্দেহ করছে—বঙ্কুদা দিনকতক ফেরার থাকবে—এটা আমাকে রাখতে দিয়েছে।' একটু থেমে তপা পরে বলল, 'বঙ্কুদার বাড়িতে আমার যাওয়া আসা আছে। আমার কাছে রাখাও সেফ না—তাই তোর ঘরে রাখতে বলছি।'

কাগজে মোড়া জিনিসটার দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে সুদাম কি যেন ভাবল। তারপর ওপর দিকে চোখ তুলল।

'এটা দিয়ে তালা ভাঙ্গা যায় ?'

'পাগলের মতন কথা বলছিস—তালা আবার ভাঙ্গতে হয় নাকি। গলার আংটাটা কেটে ফেলতে হয়। কাস্তের মতন বেঁকান মাথাটা

তো এই জন্যই। দেখলি না কেমন খাঁজকাটা। এই দিয়ে লোহা কাটা যায়। তালার আংটা মোটা মোটা গরাদ ছিটকিনি সব। লোহা পিতল তামা কাগজের মতন ফসফস করে আলগা হয়। চলি আমি—এখন ওটা রেখে দে।' তপা বেরিয়ে গেল।

হাঁ করে বন্ধুর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে সুদাম আবার যেন কি গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল।

বুড়ী বকবক করছিল।

হয়তো ভেবেছে সুদাম বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু টগরের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। তা হলেও সুদাম টগর বা বুড়ির কথা আর একবারও ভাবছিল না। তন্ময় হয়ে সে সিঁদ-কাঠির কথা চিন্তা করছিল। বন্ধুর বড়লোক হওয়ার কথা চিন্তা করছিল।

বিকেলে ভল্টু এসে হাজির।

সুদামের ভাল লাগল না। সারাদিন একটা অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়েছে সে। কখন বিকেল হবে আর টুপ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে শ্যামবাজারের ট্রামে চেপে বসবে কেবল এই চিন্তা মাথায় নিয়ে সে ঘণ্টাগুলি পার করেছে। যেন সময় কাটছিল না।

না আজ সুদামের স্নান খাওয়া হয়নি।

ঘরে শুয়ে একটা সিনেমার কাগজ উল্টে পাল্টে দেখে সময় কাটিয়েছে। টগর দুবার তাকে ডাকতে এসেছিল। সুদাম কথা বলেনি। ফিরে তাকায়নি।

সকালের সেই ঝগড়াঝাঁটির পর থেকে বার বার তার মনে হয়েছে বাড়ি ছেড়ে দিন কতকের জন্য সে অন্য কোথাও চলে যাবে। বাড়ির আবহাওয়াটাই যেন তার সহ্য হচ্ছে না।

বুড়ী শীগ্‌গির মরবে না টগরেরও শীগ্‌গির বিয়ে হবে না।

কাজেই অশান্তি চলবে। দিনের পর দিন সুদামকে এটা সহ্য করতে হবে।

বয়ে গেছে তার সহ্য করতে।

মেয়েমানুষ না সে। ব্যাটাছেলে। কাজেই তার অত ভাবনার কি। থাকুক পড়ে ঘাটের মড়া ঐ ঠাকুমা আর আইবুড়ো বোন। যদি সুদাম আজ গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মারা যায় তো অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? বা কলেরা বসন্ত কোন রোগে?

যেমন তার বাবা অসময়ে মরে গেল?

তা বলে কি আর দিন বসে থেকেছে। দিন কেটে যাচ্ছে। সুদাম না আসলেও এদের দিন কাটবে। বেশ তো, ভূষণ পোদ্দার আছে তোমাদের দেখাশোনা করতে। পয়সার অভাব নেই। আর ভূষণ মনে মনে তো তাই চাইছে। নিজের মতন করে সে এবাড়ির দুটো মেয়েছেলেকে পাবে। তখন এবাড়িতে চলে আসবে। এখানে থাকবে খাবে শোবে। হুঁ, সুদামের এই ছোট ঘরটায় টগরকে নিয়ে ভূষণ শোবে। টগরের ছেলেপুলে হবে না?

ভাবতে গিয়ে সুদামের হাসি পেল। আর ঝাঁ করে আর একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। শোভার কি হবে? ওখানে একলা বাড়িতে থাকবে? না শোভাকেও এখানে নিয়ে আসবে? রাত্রে বুড়ির সঙ্গে শোভা শোবে।

চিত্রটা মনে মনে কল্পনা করল সুদাম।

রাত্রে বুড়ির সঙ্গে শুয়ে আছে শোভা। আর এঘরে দরজায় খিল এঁটে টগর ও ভূষণ। শোভা শুয়ে শুয়ে বুড়ির সঙ্গে গল্প করছে। গল্প করতে করতে এক সময় বুড়ির আর সাড়া পাচ্ছে না। বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু শোভার চোখে ঘুম নেই। কেন ঘুম আসবে। তার বাবার সঙ্গে তার বয়সের একটা মেয়ে পাশের ঘরে শুয়ে আছে।

পোকার মতন চিন্তাটা তার মাথার ভিতর কিলবিল করছে। আর সহ্য হল না, আর থাকতে পারল না। বুড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে টের পেয়ে শোভা বিছানা থেকে নেমে পা টিপে টিপে ওঘর থেকে বেরিয়ে এঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল তারপর কান পেতে থাকল। কিছু শুনছে কি ? কি শুনবে। ভূষণ পোদ্দার কাঁচা ছেলে না, টগরও কম সেয়ানা মেয়ে না। বাইরে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে কেউ কিছু শুনবে এমনভাবে তারা কথাই বলবে না। ভয়ানক চাপা গলায় কথা বলবে। চাপা গলায় ওরা হাসবে। টিকটিকিটিও শুনতে পাবে না। বাঃ, বেশ মজা হয় তা হলে। যদি শোভা অন্ধকার বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। আর টগরকে পাশে নিয়ে ভূষণ পোদ্দার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরশোলা টিকটিকি শুনতে পায় না এমনভাবে কথা বলে—হাসে। বেশ মজা হয়। চমৎকার শাস্তি হয় তা হলে ওই মেয়েটার। হ্যাঁ, যেমন স্বার্থপর অহংকারী ও। সুদাম চাইছে শোভা শাস্তি পাক—আঘাত পাক। সুদাম নিজে তো তাকে শাস্তি দিতে পারছে না। তার বাবার কীর্তি দেখে যদি শোভা জব্দ হয়।

চমৎকার একটা ছবি কল্পনা করে সুদাম বুঁদ হয়ে থাকতে পারত, এমন সময় ভল্টু এসে হাজির। সুদামের এত খারাপ লাগছিল ভল্টুকে দেখে। নিশ্চয় সেই গহনার দোকান লুট করার ব্যাপারে তারা কতটা এগিয়েছে জানতে ভল্টু এখন তার ঘরে এসে ঢুকল।

'কি হচ্ছে ?'

'কিছু না। মাথা ধরেছে।'

'তবু তো তোদের মাথা আছে, তাই ধরে।' ভল্টু বিছানার পাশে বসল। সুদাম পা-টা একটু গুটিয়ে নিল।

'আরে শালা উঠে বোস না—' ভল্টু ভেংচি কাটল। 'না হয় মাথা ধরেছে—কোমরে বাত নামেনি তো ?'

কথা না কয়ে সুদাম উঠে বসল। হাই তুলল।

'তারপর—খবর কি ?' পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করল ভল্টু। সুদামের বুকের ভিতর টিপটিপ করছিল। যা সে আশঙ্কা করছে। নিশ্চয় উল্টাডাঙ্গা আর বৌবাজারের গুণ্ডা-টুণ্ডাদের ইতিমধ্যে খবর দিয়ে এসেছে ভল্টু। হয়তো বোমা টোমাও জোগাড় করা হয়ে গেছে। সুদামের মুখটা শুকিয়ে গেল।

'কিসের খবর ?' ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে ভল্টুর মুখটা দেখছিল সে। সিগারেট ধরাচ্ছে। ভল্টুর গালে একটা কাটা দাগ। অনেক দিনের। কিন্তু আজ যেন নূতন করে দাগটা সুদামের চোখে পড়ল। তার হঠাৎ মনে হল কবে যেন ভল্টু কোথায় কাদের সঙ্গে মারামারি করেছিল, যেন কোথায় ডাকাতি করতে গিয়েছিল। তখন আঘাত পেয়েছিল। সেই দাগ। আজ নূতন দেখছে না সে ভল্টুকে। অনেক দিনের বন্ধু। কিন্তু তবু সুদামের মনে হল মানুষটার সঙ্গে তার নূতন পরিচয় হয়েছে। ভয়ানক গুণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। এর সঙ্গে মেলা-মেশা করা বিপজ্জনক। কোথায় কোন্ বৌবাজারের সিধু উল্টাডাঙ্গার নিতাইয়ের সঙ্গে তার ভাল রকম জানা শোনা রয়েছে। কাজেই—

বলতে কি, সুদামের একবার ইচ্ছা হল ভল্টুকে বলে দেয় সে যেন আর তার কাছে না আসে। ডাকাতি করার ইচ্ছা তার নেই। সে জেল খাটতে পারবে না। জেলখানাকে সে ভয় করে। তপাও ভয় করে। তপাও এভাবে বাইরের গুণ্ডাদের সঙ্গে একত্র হয়ে ডাকাতি করতে নারাজ।

'কি হল, চুপ করে রইলি যে ?' এক গাল ধোঁয়া বের করে ভল্টু তক্তপোষের ওপর পা তুলে বসল। সুদাম প্রমাদ গণল। এদিকে বেলা শেষ হয়ে এসেছে তাকে বেরোতে হবে।

'মনটা ভাল না।' বিষণ্ন গলায় সে উত্তর করল।

ভল্টু আবার একটা ভেংচি কাটল।

'তোদের মন আছে—তাই কখনো তা ভাল থাকে আবার কখনো সেটা খারাপ হয়ে যায়।'

এবার সুদাম না হেসে পারল না।

কেন তোর কি মন বলে কিছু নেই?

নেইই তো—মনও নেই মাথাও নেই—তাই তোদের মতন আমার মন খারাপ হয় না, মাথাও ধরে না।'

'ভাল, তুই ঈশ্বর।'

'ঈশ্বর ব্যাটার মন মাথা দুইই আছে তা না হলে অত মনোযোগ দিয়ে তোদের মতন সাতশ গণ্ডা মানুষ তৈরী করত কখনো।'

এখন একটু সাহস হল সুদামের। তবে বোধ হয় ডাকাতি টাকাতির ব্যাপার নিয়ে ভল্টু কথা বলতে আসেনি। এমনি আড্ডা দিতে এসেছিল। তাই আর একটু বড় করে হাসল সে।

'তা হলে তোকে তো ঈশ্বর তৈরী করেনি—মন মাথা কিছুই যখন নেই তোর।'

'নাই তো—আমায় তৈরী করছে শয়তান। মদ ধরেছি বেশ্যাবাড়ি যেতে আরম্ভ করেছি।' দাঁত বের করে ভল্টু একটু হাসল। সুদাম চুপ করে রইল। ভল্টু যে এতটা খারাপ হয়ে গেছে তার ধারণা ছিল না।

'বুঝলি, ভাল ছেলে হয়ে থাকাটা কিছু না। আমি অনেক চিন্তা করেছি। তুই ভাল হয়ে থাকলেও, যদি কাজকর্ম না করিস্ টাকাপয়সা রোজগার না করিস্ লোকে তোকে খারাপ চোখে দেখবে। ভল্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কথাটা সুদামের ভাল লাগল। তাই আর না হেসে ভল্টুর মতন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'হ্যাঁ তা ছাড়া আর কি। আমার অবস্থাও তাই। চাকরি তো আর গাছের ফল না। আর এই বিদ্যায় কে আমাদের চাকরি দেবে বল্। তা বলে ভদ্দরলোকের ছেলে চায়ের দোকানে ঢুকে

তো আর বয়গিরি করতে পারব না। তেমন পুঁজি নেই যে কারবার টারবার খুলে বসব।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভল্টু তার পিঠের জামাটা তুলে ধরে ঘুরে বসল।

'ছাখ্ আমার পিঠটা ছাখ্।'

ভল্টুর পিঠে কালে কালো দাগ।

'কি হয়েছিল!' সুদাম বিড়বিড় করে উঠল।

'আমার বাবা খড়ম পায়ে দেয় জনিস, খড়ম দিয়ে মেরেছিল।'

সুদাম আবার চুপ করে রইল।

'আমি ঠিক আত্মহত্যা করব—বুঝলি, বাবার অত্যাচার আর সহ্য হয় না।'

'আমিও সন্ন্যাসী হয়ে টয়ে কোথাও চলে যাব।' সুদাম ফোঁস করে আর একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল। 'বাড়িতে থাকব না। রাত দিন বুড়ির বকুনি—আর ওই ট্যারা ছুঁড়ির মুখ ভার—সহ্য হয় না এসব।'

'আহা, তোকে তো কেউ মারধর করে না।' ভল্টুর চোখ ছলছল করে উঠল। 'আর আমায় কি মারটাই কাল মারল। মুখে মদের গন্ধ পেয়েছে। আমি নাকি এই করে তার সম্পত্তি উড়িয়ে দিচ্ছি।' একটু থেমে চোখ দুটো জামার হাতায় মুছে ফেলে ভল্টু বলল 'বাবার কাছে আমি আজ পর্যন্ত হাত পাতিনি—হাত খরচের টাকা মার কাছ থেকে যা পাই তাই দিয়ে একটু দিশী টানি। নেশা হয়ে গেছে ছাড়তে পারি না। তাই রোজ সন্ধ্যাবেলা একটু—পাঁচ সাত আউন্স—বড় জোর একটা দু নম্বর পাইট—অতেই আমার চমৎকার নেশা হয়—আর তাতেই কিনা এমন গরুর মতন মার—'

'তোর মা কি বলছিল তখন—তোর বাবাকে বারণ করেনি এভাবে মারধর করতে?'

হুঁ, মার কথা শুনতে তার বয়ে গেছে—' সুদামের চোখে চোখ

রেখে ভল্টু মুহূর্তকাল কি চিন্তা করল। 'তবে আজ তোকে একটা কথা বলি—কাউকে বলিস না—তপাকেও আমি কোনদিন বলিনি—আমার বাবাও মদ খায়। মদ খায় এবং মেয়ে মানুষ পোষে। আমি ঠিকানাও জেনে ফেলেছি। হাতিবাগানের কাছে একটা বাড়িতে থাকে মেয়েছেলেটা। বুঝলি, এমনি আমার বাবা খুব সাধু মানুষ। গলায় তুলসীর মালা—খড়ম পরে থাকে, দেখেছিস তো—কিন্তু ভেতরে ভেতরে বদের শিরেমণি,। এখন, ব্যাপারটা তো বাইরের কেউ জানে না। আমার মা জানে। মা অনেকদিন আগেই টের পেয়ে গেছে। মদের গন্ধ আগে আগে আমি টের পেতাম না। ভাবতাম পানের সঙ্গে দামী জর্দাটর্দা খায়, তাই বাবার মুখে কেমন একটা গন্ধ। আজ আমি নিজে মদ খাচ্ছি—কাজেই সব বুঝে গেছি; আর ঐ হাতিবাগানের কথাটা ধরে ফেললাম অন্যভাবে। একদিন কি নিয়ে মা ও বাবার মধ্যে রাগারাগি কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। হুট করে মা হাতিবাগানের শৈলরাণীর নাম বলে ফেলেছিল। বলছিল, সব টাকা শৈলরাণীর হাতবক্সে চলে যাচ্ছে, এই সংসারের দিকে বাবার তেমন দৃষ্টি থাকার তো কথা না। আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে শুনছিলাম। ভাবলাম, ভাল রে ভাল শৈলরাণীটা আবার কে—ঐ নামে তো আমাদের পিসি মাসী কি খুড়তুতো জ্যাঠতুতো বোনদের মধ্যে কেউ নেই—আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন টালা টালিগঞ্জ হাওড়া শিবপুর বেহালা বেলেঘাটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে আছে তুই জানিস। কিন্তু হাতিবাগানে তো আমাদের কেউ নেই। মার মুখে ঐ নামটা শোনার পর থেকে আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ সন্দেহ হতে আরম্ভ করল। একদিন সন্ধ্যেবেলা বাবা বাড়ি থেকে বেরোবার পর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছু নিলাম। তারপর ঠিক জায়গায় পৌঁছে ঠিক বাড়িটা চিনে রাখলাম। গ্রেস্ট্রীটের মুখোমুখি একটা গলির মধ্যে লাল রঙের একটা দোতলা বাড়ি—'

ভল্টু এখানে থামল।

সুদাম ঠোঁট টিপে হাসল।

'তা কেবল লাল রঙের দোতলা বাড়িই দেখে এলি—মানুষটাকে দেখলি না?'

'হ্যাঁ, দেখব না কেন। তার সঙ্গে কথা বলেছি—তার বিছানায় পর্যন্ত বসে এসেছি—আমি কি যেমন তেমন ছেলে—' ভল্টু সামান্য হাসল।

সুদামের চোখ বড় হয়ে গেল।

'বলিস কি—তোর বাবা কিছু বলল না?'

'তোর মাথায় কিছু নেই। গোবর ছাড়া আর কিছু নেই তোর ঐ ঢাউস মাথাটার ভেতর। বাবা থাকতে থাকতে কি আর আমি শৈলরাণীর ঘরে ঢুকেছিলাম—'

'ও'—এখন সুদাম বুঝতে পারল। 'আর একদিন সেখানে গিয়েছিলি অন্যদিন ঢুকেছিলি ওর ঘরে তাই না?'

ভল্টু বিজ্ঞের মতন ঘাড় কাত করল।

'গুণে গুণে পঁচিশটা টাকা নিলে মেয়েটা—বুঝলি—তা হ্যাঁ, মেয়ের মতন মেয়ে বটে—আগুনের ফুল। আমার বাবার পঞ্চাশের ওপর বয়েস হয়েছে—আর শৈলর বয়স একুশের বেশি না।'

হঠাৎ একটা কথা মনে হতে সুদাম চুপ থেকে নিজের মনে কি যেন ভাবল।

'দু দিন গেছি শৈলর ঘরে—গুণে গুণে পঞ্চাশটা টাকা নিয়েছে আমার কাছ থেকে—একটা পাই-পয়সা ছাড়ল না, এমন শক্ত মেয়েটার মন।'

'তো তুই দ্বিতীয় দিন যখন গেলি তখন পরিচয়টা দিলি না কেন, তোদের বাবার নাম বললি না কেন—বলতে পারতিস তোর বাবা এত এত টাকা দিচ্ছে—আজ দু'চার টাকা কম নাও।'

'তুই একটা ছাগল—একটা গাধা। বাবার নাম বললে আর আমায় ও ওর ঘরে ঢুকতে দেবে নাকি।'

'কেন, বাপ ব্যাটাকে বুঝি ওরা এক সঙ্গে ঘরে তোলে না?' সুদাম এবার ফিক্ করে হাসল।

ভল্টু মাথা নাড়ল।

'তা জানি নে। তবে বাবার পরিচয় দিলে সেখানে বাবাকেও ছোট করা হ'ত আমাকেও ছোট করা হ'ত—মেয়েটা ভাবত, এমন বাপের এমন গুণধর ছেলে—আবার ভাবত এমন ছেলের এমন বাপ না হয়ে যায় কখনো—ভাল করে গোফ দাড়ি গজায়নি—এখন থেকেই বেশ্যাবাড়ি—'

'থাক গে—' সুদাম চোখের ইসারায় ভল্টুকে থামিয়ে দিল। যেন বারান্দার ওদিক দিয়ে টগর যাচ্ছিল। টের পেয়ে ভল্টু চুপ করে যায়।

'তপার খবর কি?' একটু পর ভল্টু প্রশ্ন করল।

'সকালে এসেছিল। সুদাম মিনমিনে গলায় উত্তর করল। হঠাৎ আবার তার আশঙ্কা হচ্ছিল ভল্টু না সেই ডাকাতির কথায় ফিরে যায়।

'আমাদের মধ্যে তপাটাই একটু খুনে আছে, কি বলিস?' ভল্টু কথা বলল না।

'রোদটা একেবারে নিভে গেছে' সুদাম ছটফট করতে লাগল। ভল্টু এমন ভাবে বসে আছে উঠবার নাম নেই। অথচ সুদামকে এখনই বেরিয়ে পড়তে হয়। ভল্টুর পকেট থেকে সুদাম একটা সিগারেট তুলে নিল। 'দেশলাইটা দে।'

ভল্টু তার হাতে দেশলাই ছুঁড়ে দিয়ে একটু সোজা হয়ে বসল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'বারান্দায় কেউ আছে?'

'না মনে হয় কেন?'

সুদাম সিগারেট ধরান শেষ করে ভল্টুর চোখের দিকে তাকাল।

'বুঝলি, আগুনের ফুল—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবি না'

সুদাম ঢোক গিলল।

'সেই শৈলরাণীর কথা বলছিস?'

'হুঁ, একদিন যাবি ওখানে?'

'টাকা কোথায়—এত টাকা আমার আছে নাকি—বাপ্—এক থোকে পঁচিশটা টাকা—'

'তাতে কি—একদিন ভাল করে ফুর্তি করতে পঁচিশ ত্রিশ টাকা খুব বেশি হল?'

'না খুব বেশি না—' যেন গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল সুদাম। 'খুব বেশি না—যেমন রূপের কথা বলছিস—তা তোর মতন বড় লোক হলে চেষ্টা করে একদিন দেখা যেত—'

ভলটু নূতন সিগারেট ধরাল।

'ছাখ্, টাকা কেউ হাতে তুলে দেয় না—চেষ্টা করে জোগাড় করতে হয়—মা আর কত হাত খরচ দেয় আমায়—কিন্তু ঐ সব বাড়তি খরচের জন্য আমাকেও চেষ্টা চরিত্তির করে টাকা জোগাড় করতে হয়—'

সুদাম চুপ করে রইল। তবে তো সেই ডাকাতি রাহাজানির কথায় ফিরে যাচ্ছে ভলটু।

'শোন্' ভলটু হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তোদের বাড়িতে সেই মেয়েটা আর আসে না?'

'কে—কোন্ মেয়ে?' সুদাম চমকে উঠল।

ভলটু ঠোঁটের কোনায় হাসল।

'মনে হল যেন আকাশ থেকে পড়ছিস। ভূষণ পোদ্দারের মেয়ে—ভূষণ তো এখনো রোজ রাত্রে তোদের বাড়ি আসছে দেখছি।'

সুদামের মুখটা কালো হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলল,—'হ্যাঁ, ঐ আমার ঠাকুমার দূর সম্পর্কের ভাই—তাই বুড়িকে দেখতে আসে রোজ একবারটি করে—'

'আর মেয়েটি ? খুব তো কদিন শ্যামবাজার যাচ্ছিলি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।'

সুদাম হঠাৎ চুপ করে রইল।

'এখন আর তোদের বাড়ি তেমন আসছে না যেন। তুই আর শ্যামবাজার যাস না ?'

'না।'

'কেন ?'

'এম্নি '

ভল্টু একটু হতাশ হল। তারপর টেনে টেনে হাসতে আরম্ভ করল। 'ত্যাখ্, তুই চলিস ডালে ডালে আমি ফিরি পাতায় পাতায় —আমার চোখে ধুলো দিতে পারবি না। ওই মেয়ে আর আসছে না কেন আমার বুঝতে বাকি নেই। পীরিতটা এখন গাঢ় হচ্ছে মন হয়েছে। জল মিশিয়ে যখন গুড়ের রস পাক হয় তখন প্রথমটায় খুব ফেনা হয় রস উথলে উথলে ওঠে। তারপর রস গাঢ় হতে থাকে শক্ত হতে থাকে—তখন আর ফেনা থাকে না রস উথলে ওঠে না। ভালবাসাটা তাই। এখন আসা যাওয়া একান্ত দুজনের ট্রামে বাসে বেড়ানো বন্ধ হয়েছে—কিন্তু তলে পীরিত ঘন হয়ে গাঢ় হয়ে জমতে আরম্ভ করেছে।'

সুদাম হাসল।

'না না, মাইরি—তুই যা ভাবছিস মোটেই তা নয়—'

'আবার মিছে কথা বলছিস।' ভল্টু ধমক লাগাল।

'এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি—' ভল্টুর হাত ধরল সুদাম। 'আমারও প্রথমটায় মনে হত আমায় বুঝি ও ভালবাসে, আমার ওপর খুব টান আছে—কিন্তু আসলে তা না। এখন বুঝতে পারছি —মেয়েটা ভয়ানক স্বার্থপর অহঙ্কারী।'

ভল্টু দার্শনিকের মত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে হাসল

'ত্যাখ্ সুদাম সংসারে ভালবাসা টাসা বলতে কিছু নেই—

প্রেমটেম সব ছেঁদো কথা। আসলে এই দুনিয়া স্বার্থ ছাড়া কিছুই সত্য নয়। তবে কিনা, আমি তোমায় ভালবাসি—তোমার ওপর আমার খুব টান আছে নিজের স্বার্থের জন্য মাঝে মাঝে এমন ভান করার দরকার হয়। একটু থেমে থেকে ভল্টু আবার বলল, 'তুই কি মনে করিস আমার বাবা মাকে ভালবাসে, না মা বাবাকে ভালবাসে? একটুও না। আমি সেই ছোটবেলা থেকে দুটি মানুষের চোখ দেখে বুঝে গেছি—তারা একজন আর একজনকে ভীষণ ঘেন্না করে মনে মনে। কিন্তু ওই যে বললাম, স্বার্থ—আমার স্ত্রী আছে পুত্র আছে, আমি ঘোর সংসারী মানুষ সৎ মানুষ। বাইরের মানুষকে এটা দেখাতে হয় বলে বাবা শৈলরাণীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার সুড় সুড় করে রাত দুপুরে বাড়ি ফেরে? আর মা মনে করে আমার স্বামী আমার পুত্র আমার চারতলা বাড়ি অনেক টাকা পয়সা আত্মীয় স্বজন পাঁচজন আমার সুখ দেখে ভাবে, আহা সতী লক্ষ্মী তো এই—শুধু এই সুনামের মোহই এই সুযশের দিকে তাকিয়ে মাকেও তার মাতাল স্বামীকে বিছনায় জায়গা দিতে হয়—না হলে একজন আর একজনকে ভেতরে ভেতরে কী ঘেন্নাটাই না করে, সেটা ওদের ভাল করে না দেখলে বোঝা যায় না। প্রেম ভালবাসা স্নেহ মমতা—সব স্বার্থের জন্য। আমি বাবার সম্পত্তি ভোগ করব ভেতরে এই স্বার্থ আছে বলে তো তার খড়মের বাড়ি খেয়ে চুপ করে গেলাম—এখন বুঝলি?'

সুদাম ফ্যালফ্যাল করে ভল্টুর মুখ দেখতে লাগল।

ভল্টু চলে যাবার পর সুদাম কথাগুলি চিন্তা করতে লাগল।

সংসারে প্রেম ভালবাসা বলতে কিছু নেই—সব ছেঁদো কথা। যেন সুদামের কানে ভল্টু মন্ত্র দিয়ে গেল। দুনিয়ার সবাই যার যার স্বার্থ নিয়ে আছে। তবে কি না, আমি তোমায় ভালবাসি—তোমার

ওপর আমার টান আছে। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে এমন ভাণ করা দরকার।

ভল্টু সেখানেই থেমে থাকে নি, তার পরেও সুদামকে যে কথা বলে গেছে এখন আবার নূতন করে কথাটা ভাবতে গিয়ে সুদমের কেমন যেন রোমাঞ্চ উপস্থিত হল।

বলতে কি, সুদামের যেন চোখ খুলে গেছে।

এতকাল সে বোকা বনে ছিল। বোকার মতন কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে আর বুকের ভিতর একটা হা-পিত্যেশ নিয়ে ছটফট করে মরেছে।

এখন এই একটা বিকেলের মধ্যে সুদাম কেমন সেয়ানা হয়ে উঠেছে। তার মনে হল আর সে কিছুতে ভয় পায় না। তার জোর বেড়ে গেছে। কোন ব্যাপারে আর সে মন খারাপ করবে না। সুদাম শিস দিতে আরম্ভ করল।

—টগরের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে দুপুরে স্নান করেনি। কলতলায় বসে সে ভাল করে স্নান করল। ঘরে এসে আরসির সামনে দাঁড়িয়ে চমৎকার টেরি কাটল। মুখে একটু স্নো পাউডার মাখল তারপর জামা-জুতো পরে বেরিয়ে পড়ল।

বাস স্টপের কাছে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল সুদাম। চা খেয়ে একটু সময় কাটানোর জন্য সেখানে ঢুকল। ঠিক সন্ধ্যের মুখে সে ভূষণ পোদ্দারের বাড়ির পাশের সেই গলিতে উপস্থিত থাকতে চায়। তার আগেও না পরেও না! কেননা ঠিক ঐ সময় সেখানে দাঁড়ালে বোঝা যাবে ওপরে শোভার ঘরে কে আছে কে নেই —আর গলির পথে বাড়িতে ঢুকবার সেই সরু দরজার চৌকাঠে কোনো ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে কি না। দাঁড়ালে ভাল—না দাঁড়ালে ক্ষতি নেই। যদি গেটে দাঁড়িয়ে থাকে তবে সুদাম আগে তার ঘরে ঢুকবে। না দাঁড়ালে সরাসরি সে শোভার কাছে চলে যাবে। ওপরে উঠে যাবে।

চা খেতে খেতে সুদাম মনে মনে একটা অভিনয়ের মহড়া দিতে লাগল। শোভা, পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তোমাকে না পেলে আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে থাকবে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। এসো, আমার কাছে এসো, আমার বুকের কাছে এসো।

কিন্তু শোভা যদি আবার রাগ করে? সুদামের দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকায়? এখান থেকে বেরিয়ে যাও—যদি বলে বসে?

দশ নয়া খরচ করে একটা চুলের চিরণও উপহার দেবার যার ক্ষমতা নেই সে আবার ভালবাসা জানাতে আসে কোন মুখে?

কথাটা চিন্তা করে সুদাম কেমন স্তব্ধ হয়ে রইল। চায়ে চুমুক দিতে ভুলে রইল।

থাকগে, আগেই অভিনয় করতে যাওয়াটা—তুমি ছাড়া আমার পৃথিবী অন্ধকার বলে শোভাকে কাছে ডেকে চুমো খাওয়াটা ঠিক হবে না। অভিনয়ের জন্য জমি তৈরী করতে হবে। বরং দু চার পাঁচ টাকা খরচ করে আগে সে মেয়েটাকে যা হোক একটা কিছু উপহার দিয়ে আসুক। তার পর একদিন—

মোটের ওপর ভল্টুর শিখিয়ে দেওয়া প্ল্যান তাকে কাজে লাগাতেই হবে।

আজ বরং সে ঐ বৌটার কাছে যাবে। এখানে আর সুদাম অভিনয় করবে না। ওর সঙ্গে অভিনয় করা চলে না। বরং সুন্দর মুখটা মনে পড়তে সুদামের মাথার ভিতরটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। পা দুটো হাত দুটো সব শরীরই যেন অবশ হয়ে এলো।

ভল্টু তখন বলছিল বটে, ভালবাসা প্রেম বলতে কিছু নেই। ঐ বৌটির সঙ্গে যে সুদাম প্রেম করতে যাচ্ছে তা-না। এমনি দুজনের মধ্যে—মোট একদিন তো তাদের কথাবার্তা একটু মেলামেশা হয়েছে, এখনি ভালবাসা জন্মেছে বলা চলে না। তা ছাড়া আর একজনের স্ত্রী। ঘরে শ্বশুর শ্বাশুড়ি আছে। কাজেই স্বামীর মন যুগিয়ে শ্বশুর শ্বাশুড়ির সেবা যত্ন করে ঘরের পাঁচটা কাজ সেরে তার

পর বাইরের একটি ছেলেকে কতটা ভালবাসতে পারবে—তার কথা ভেবে কতটা সময় দিতে পারে সেটা বলা মুস্কিল। সুদাম বৌটির অসুবিধার দিকটাই দেখেছিল। নিজের দিক থেকে অবশ্য তার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তা হলেও শোভাকে যেমন সে ভালবাসতে গিয়েছিল এই মেয়েটির বেলায় যেন সে ধরণের ভালবাসা খাটবে না। শোভাকে একদিন বিয়ে করে ঘর সংসার পাতবে, ছেলেপুলে হবে, সুদামকে সংসারের খরচ চালাবার জন্য টাকা রোজগার করতে হবে ইত্যাদি নানা ভাবনা মাঝে মাঝে তার মনে উঁকি দিত। এবং একটু ভয়ও করত। যেন ঐ ভালবাসার মধ্যে একটা দায়িত্ব আছে। কেমন একটা বাঁধা ধরা পথ ধরে চলা, কতগুলি সংসারিক নিয়ম মেনে চলার প্রশ্ন আছে। এই বৌটির বেলায় অন্য রকম। এটা ঠিক ভালবাসা না। ভাললাগা। যেন কতক্ষণ তুজনের তুজনকে ভাল লাগল। হঠাৎ ভাল লাগল। এর মধ্যে কোন চিন্তা নেই, পরে কি হবে না হবে সেই ভাবনা নেই। কাল আবার তুজনের দেখা হবে কি হবে না তা নিয়েও কেউ চিন্তা করছে না।

এখন আমরা তুজন একত্রে বসে গল্প করছি, এ ওর দিকে তাকাচ্ছি এটাই সত্য। ভবিষ্যতে কি হবে জানি না—অতীতে কি ছিল সেসব আমাদের ভাবনায় নেই। হঠাৎ তুটি মানুষের একে অন্যকে ভাল লাগাটা যেন পূর্ণিমার চাঁদ দেখার মতন। আজকের চাঁদ সুন্দর সব দিক ভরভরাট এটাই সত্য। কাল চাঁদ ক্ষয় পাবে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কি আগের দিন চাঁদের চারদিক এমন নিটোল ছিল না এই ভেবেও কেউ মন খারাপ করে না।

সুদামের মনে পড়ল সেদিন সন্ধ্যাবেলার ছবিটা। ঘরে আর কেউ নেই। পাশের ঘরে শ্বাশুড়ি বুড়ি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। সুদামের হাত ধরে আছে ওবাড়ির বৌ—মাঝে মাঝে তার আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করছে। সুদাম ওর কালো চোখ জোড়ার দিকে

এক দৃষ্টে তাকিয়ে। এক জোড়া কালো ফুল। বৃষ্টি হয়ে গেলে সদ্য ভেজা বনের ফুলের যে তাজা সুন্দর চেহারা হয় ওর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে সুদামের তাই মনে হয়েছিল। যেন এক জোড়া টাটকা সুগন্ধী কালো রঙের বুনো ফুল। কালো ফুল সুদাম দেখে নি। তা হলেও কল্পনা করতে ক্ষতি কি।

এখন আবার সুদামের সেই দৃষ্টি—মনে হতে তার সমস্ত শরীর সিরসির করে উঠল মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। পা হাত কেমন অবশ হয়ে এল।

ঠাণ্ডা চা-টুকু কোন রকমে গলায় ঢেলে সে উঠে পড়ল। দোকান থেকে বেরিয়ে দেখল শ্যামবাজারের বাস দাঁড়িয়ে। সুদাম মনে মনে হাসল। নিশ্চয় বৌটি তাকে মনে করছে। এখনই তো মনে করার সময়। ঘরে ঘরে এখন সন্ধ্যা দীপ জ্বলে উঠবে আকাশে তারা ফুটবে। এমন সময় কেউ একজন তাকে মনে করে বসে আছে বলে তো অত চট করে শ্যামবাজারের গাড়িটাও সে পেয়ে গেল। ট্রামে যেতে দেবি হতে পারে তাই সুদাম বাস খুঁজছিল। মনের আনন্দে লাফিয়ে সে বাস-এ উঠল।

আজ বিমলা নিশ্চিন্ত। একটু বেশি খুশি খুশি চেহারা। সেজেছেও চমৎকার। খোপায় ফুলের মালা জড়িয়েছে। কপালে পোকার টিপ পরেছে। চোখে পুরু করে কাজল বুলিয়েছে। আলতা পরেছে পায়ে। হাতের নখগুলি রং করেছে। রাণীর মত দেখাচ্ছে ওকে।

সুদামকে চা করে দিয়েছে ডিম ভেজে দিয়েছে, টোস্ট করে দিয়েছে। সুদাম আপত্তি করেছিল। বিমলা শোনেনি। ভ্রুকুঁচকে দুবার ধমক দিয়েছে। 'ভয়টা কি শুনি—কেউ তো আর এখন আসছে না এঘরে। যতক্ষণ ইচ্ছা তুমি থাকবে।'

'কত রাত হবে উনাদের ফিরতে?' সুদাম অনেকটা অশ্বস্ত হয়ে প্রশ্ন করল। সুদামও খুশি।

'ফিরবে না। বলছি তো। শ্বশুর মশায়ের ভাগ্নীর মেয়ের বিয়ে। বাপ ব্যাটা তুজনেই নেমন্তন্ন খেতে গেছে। কেশপুর থেকে এত রাত্রে আর বাস ছাড়ে না—কাজেই ফিরতে সেই সকাল। তাও বেলা নটা দশটা বাজবে।'

সব শুনে সুদামের সাহস বাড়ল। এ বাড়ির বুড়ো-কর্তা মানে বিমলার শ্বশুর কোথায় কোন কেষ্টপুর গেছে বিমলার স্বামীকে নিয়ে বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আজ রাত্রে তারা ফিরছে না। সুদামের এত আনন্দ হচ্ছিল।

'তা, তোমার স্বামীর ভাই—সেই দেওর? কি ভেবে সুদাম তৎক্ষণাৎ আবার প্রশ্ন করেছে। তিনি কখন ফিরছেন?'

'ও তো আজ তিন দিন কলকাতার বাইরে গেছে। শান্তিপুর না কোথায় বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। ফিরবে সেই সোমবার।

সুদামেব চোখ মুখ উজ্জল হয়ে উঠল।

'তা হলে বুড়ি শাশুড়ি আর তুমি কেবল বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, গো হ্যাঁ এই বেলা চা-টা খেয়ে নাও।' সুদামের গা ঘেঁষে বিমলা বসল। এমন আর হয়নি। সুদামের বুকের ভিতর কেমন ধক্ করে উঠল। বিমলার মাথার চুলের গন্ধ শরীরের গন্ধ তার নাকে লাগল। 'শাশুড়ি বাড়িতে আছে বলে কত ভয় পাচ্ছ তুমি তো জানই।' বিমলা ফিসফিস করে বলল আর ঠোঁট টিপে হাসল। নিজে থেকে এপাশ ওপাশ ফিরতে পারে না—আর একজন না ধরলে—।'

'তা হলে আর কথা কি? সুদাম লম্বা নিশ্বাস ফেলল। বিমলা তার হাঁটুর ওপর হাত রেখেছে। সুদামের আর একটুও ভয় করছিল না। আড়ষ্টতাও আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে।

'তুমি চা খেলে না।'

'আমি চা একবার খাই। তোমাদের মতন উঠতে বসতে চা

খাওয়া আমার অভ্যাস নেই।' বিমলা নিচু গলায় হাসল। 'বেশি চা খেলে গায়ের রং খারাপ হয় চেহারা নষ্ট হয়।'

'অ, তাই নাকি!' সুদাম চোখ বড় করল। তারপর স্থির দৃষ্টিতে বিমলাকে দেখতে লাগল। তারপর কি ভেবে মাথা নাড়ল ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কি হল?' সুদামের বা হাতটা কানের কাছে টেনে নিল বিমলা। 'দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন?'

'তুমি এত সুন্দর দেখছি। চা কম খাও বলে গায়ের রং এমন চমৎকার। রং—আর তোমার গায়ের চামড়াও খুব নরম।'

বিমলা সাদা-সুশ্রী দাঁত বার করে হাসল। হাসির শব্দ হল না।

'নরম চামড়া কি করে বুঝলে? তুমি তো এখনো আমার গায়ে হাত দাওনি।'

'ঐ তো, তুমি আমার হাত ধরেছ, তাতেই টের পেলাম।'

'ইস কত সহজে তুমি এটা টের পেলে—অনেকের এটুকুন টের পেতেই সারাজীবন কেটে যায়।' এবার বিমলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সুদাম হাঁ করে বৌটির কথা শুনল। তারপর একটা ঢোক গিলল।

'কেন, একথা বলছ কেন?'

'মনে এলো, তাই বললাম।'

চায়ের বাটিটা নামিয়ে রাখল সুদাম।

'একটা সিগারেট ধরাব?'

'ধরাও। বললাম তো। আজ তুমি এখানে যা খুশি করতে পার—কেউ দেখবে না কেউ কিছু বলতে আসবে না।'

সুদাম সিগারেট ধরাল।

হঠাৎ দরজার ওপাশে টুকটাক ঠুকঠাক শব্দ শোনা গেল। সুদাম চমকে উঠল। যেন সিগারেটটাও নিবিয়ে দিতে চাইল।

'কি হল!' বিমলা চোখ বড় করল।

সুদাম হাতের ইসারায় ওপাশের দরজাটা দেখাল।

বিমলা ঠোঁট টিপে হাসল ও সুদামের গাল টিপে দিল। 'ভয়ানক ভীতু—ওটা ভূষণ পোদ্দারের দোকান ভুলে গেছ—কারিগররা কাজ করছে।'

তাও বটে! সুদাম এতক্ষণ ভুলে ছিল! দরজার ওপাশটাই ভূষণের দোকান। 'নূতন জায়গা—হঠাৎ সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।' এবার সে বিমলার কোলের ওপর হাত রাখল। ক্রমশ তার সাহস বাড়ছে নিজেই বুঝতে পারছিল।

'নূতন পুরোনো হয়ে যাবে—পুরোনো হতে কতক্ষণ আর লাগে। রোজ একটিবার করে আসবে এ ঘরে—এমন সময়—সন্ধ্যাবাতিটি যখন লাগবে।'

বিমলা বলল। কিন্তু সুদাম অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ভূষণের ঘরের দিকের বন্ধ দরজাটা দেখছিল।

'কি ব্যাপার! ওদিকে খুব তাকাচ্ছ?' বিমলা একটু বিরক্ত হল। 'না কি ভাবছ কেউ ওই দরজা খুলে এ ঘরে এসে ঢোকে?'

'না না—তা নয়।' সুদাম গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। 'দোকানের মানুষ তোমার শোবার ঘরে ঢুকবে কেন। তা ছাড়া ওটা সর্বদা তালা বন্ধ থাকে সেদিন বলেছিলে আমায় মনে আছে।'

'তবে কি দেখছ!'

'ভাবছি এদিক থেকে দরজাটা কোনরকমে খোলা যায় কি না।'

বিমলা চোখ বড় করল ও কৌতুকের সুরে বলল—

'কেন, সিঁদ কাটবে নাকি গহনার দোকানে।'

'তা একরকম মন্দ হত না।' সুদাম এমনভাবে তাকাল ও এমন সুরে কথা বলল যেন সেও কৌতুক করছে। 'বেশ কিছু সোনাদানা হাতে আসত।'

'কি করতে অত সোনাদানা দিয়ে?'

'অনেক কিছু করা যেত!' সুদাম সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। 'সোনাদানা হাতে থাকলে কত কি করা যায়!'

'কি কি করা যায় শুনি?'—বিমলা যেন নাছোড়বান্দা। 'আমায় বল না।'

হঠাৎ কিছু না বলে সুদাম ওর চোখে চোখ রেখে নীরবে একটু হাসল।

কিন্তু বিমলা তাতে আশ্চর্য হল না। বরং মুখখানা কালো করে ফেলল। 'তা, আমায় তুমি বলবে না জানি—কিন্তু এত সোনাদানার লোভটা হঠাৎ কেন হল মুখ্যুসুখ্যু হলেও কিছু কিছু বুঝতে পারি।'

'কি বুঝতে পারছ শুনি?' সুদামের মুখের হাসিটা নিভে গেল যেন কি মনে করে বৌটি হঠাৎ রাগ করেছে টের পেয়ে ওর ত্বু কাঁধের ওপর হাত তুটো আস্তে আস্তে তুলে দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সে চোখ তুটো দেখতে লাগল।

বিমলা নীরব।

'কি হল!' সুদাম অস্বস্তি বোধ করছিল।

'কিছু হয়নি।' কেমন যেন উদাস গলা ওর। অন্যদিকে দৃষ্টি। যেন দেওয়ালের ব্রেকেটে ঝোলান স্বামীর ময়লা ধুতি পাঞ্জাবিটা দেখছিল। একটু সময় এভাবে কাটল। তারপর ও চোখ ফেরাল। সুদামের মুখের দিকে তাকাল।

'সোনাদানা হাতে এলে আর টাকাপয়সার ভাবনা থকেবে না। তখন তুমি বড়লোক। আর তখনই কাজটা সেরে ফেলবে আর কি—?'

'কি কাজ!' সুদাম আবার অবাক হল।

'শোভাকে বিয়ে করবে। এখন তো একগাছি সুতোও উপহার দিতে পারছ না। তখন কত শাড়ি, শায়া হবে গয়না গাঁটি হবে। মেয়ের মান অভিমান আর থাকবেনা—'

বিমলা কথা শেষ করতে পারল না। সুদাম হাত দিয়ে ওর ঠোঁট

চেপে ধরল। 'চুপ চুপ—উঃ হঠাৎ তুমি কত কি সব বলতে আরম্ভ করলে—না—না—কক্‌খনো না। কোন—দিন না। ওটাকে আমি দু চোখে এখন আর দেখতে পারি না। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—' যেন অত্যধিক ব্যস্ত হয়ে এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে সুদাম হাঁপাতে আরম্ভ করল।

একটু বুঝি খুশি হল বৌটি।

'তবে? তুমি তো বললে অনেক কিছু করতে সোনাদানা পেলে—আমি ভাবলাম—'

'তোমাদের মেয়েদের ঐরকমই ভাবনা।' সুদামের স্বর অভিমানে কেমন গমগম করে উঠল। যেন চোখ দুটোও ছলছল করতে লাগল।

'আহা—আমি কি আর খুব চিন্তা করে বলেছি কথাটা—ভাবলাম, কি জানি—' আদরের ভঙ্গিতে সুদামের গলা জড়িয়ে ধরে বিমলা তাকে কাছে টানতে সুদাম কেমন যেন ভেঙ্গে পড়ে ওর বুকের ওপর মুখ রাখল তারপর মেয়েদের মতন ফুলেফুলে কাঁদতে আরম্ভ করল।

বিমলা তার পিঠে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। 'ছি—কাঁদে না—ছেলেমানুষের মতন কাঁদে না—সত্যি আমি ঠাট্টা করছিলাম—আমি কি জানি না—আমি খুব জানি—সেদিন তো বুঝে গেছি—শোভাকে তোমার একটুও ভাল লাগে না—বিষের মতন মনে হয়। তোমার মতন ভাল ছেলে ওই মেয়েকে ভালবাসতে পারে না—ভয়ানক অহংকারী ভীষণ স্বার্থপর—মনটা একটুও ভাল না মেয়েটার—ছি কাঁদে না।'

আদর পেয়ে সুদাম একটু শান্ত হল।

বিমলাও চুপ করল।

সুদাম তেম্নি ওর বুকের ওপর মুখটা চেপে ধরে রাখল। যেন এভাবে সে বিশ্রাম করছিল। বিমলার চোখের পাতা পড়ছিল না। হঠাৎ যেন নিশ্বাসও ফেলছিল না ও।

একটু পর সুদাম ঘাড়টা সোজা করে তুলে ধরল।

'আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে তুমি জান? তখন হঠাৎ সোনাদানার কথা কেন বললাম?'

'কেন?' বিমলা এখন অবাক হল। হঠাৎ যেন চোখ দুটো জ্বলছে ছেলেটির। গলার স্বরটাও আর নরম না। বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। যেন মনে মনে ভয়ানক কিছু একটা ঠিক করে ফেলেছে সে। একটা সংঘাতিক ইচ্ছা তার বুকে এসে বাসা বেঁধেছে। সুদামের চোখের দিকে তাকিয়ে বিমলার চোখের পলক পড়ছিল না। আবারও যেন নিশ্বাস ফেলতে ও ভুলে রইল।

'আমি সেদিন সব সোনাদানা তোমায় দিতাম। তোমার অনেক গয়না গড়িয়ে দিতাম।' বলে সুদাম আবার ওর বুকের ওপর ঢলে পড়ল।

বিমলা তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। তার পর আস্তে আস্তে বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি—তখনই অবশ্য অনেকটা আঁচ করেছিলাম—তারপর ভাবলাম, কি জানি, শোভাকে একদিন ভালবাসত, যদি কখনো সে বড় লোক হয়—'

'তোমাকে—তোমাকে নিয়ে আমি কোথাও চলে যেতাম। কোন দূর দেশে। যেখানে আমাদের কেউ চেনে না জানে না। সেখানে মনের মতন একটা বাড়ি করে দুজনে থাকতাম।'

'কিন্তু আমার যে স্বামী আছে—শ্বশুর শাশুড়ি আছে। ওঁদের ছেড়ে কি যেতে পারব।' বুদ্ধিমতী বিমলা এবার কেমন করে যেন হাসল।

সুদাম ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হল। যেন এতক্ষণ কথাটা সে ভাবেনি তাই হঠৎ চুপ করে ভাবতে আরম্ভ করল। বিমলা তার আঙ্গুলগুলি নিয়ে খেলা করতে লাগল।

'হ্যাঁ তা অবশ্য সত্য।' বেশ কিছুক্ষণ ভেবে সুদাম ধীরে ধীরে বলল, 'তবে অনেক মেয়ে, স্বামী থাকলেও যদি আর কাউকে স্বামীর

চেয়েও বেশি ভালবাসে তো তখন স্বামীকে ছেড়েও চলে যায়—চলে গেছে শুনেছি।'

একটু সময় চুপ থেকে বিমলা বলল, 'হ্যাঁ, তা যায়। অনেক মেয়েই স্বামী ছেড়ে স্বামীর ঘর সংসার ছেড়ে আর এক পুরুষের সঙ্গে চলে গেছে। কিন্তু সেখানে মেয়েটির ভালবাসাই সব না। নিশ্চয় পুরুষটিও খুব ভালবাসত। হয়তো সেই ভালবাসাটা এত বেশি যে মেয়েটি তার স্বামীর কথা ভুলে থাকত—স্বামীর ভালবাসা চাপা পড়ে যেত পরপুরুষের ভালবাসার কাছে। কাজেই—'

'বেশ তো আমিও তোমায় এমন ভালবাসব যে স্বামীর ভালবাসা তুমি ভুলে যাবে—স্বামীকে তোমার মনে থাকবে না। আমি কি পারব না তেমন করে বাসতে?' সুদাম ওর বুকের ওপর থুতনিটা ঘষতে আরম্ভ করল। কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে বিহ্বল হয়ে উঠছে সে। লক্ষ্য করে বিমলা বুঝি তৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'বেশ তো আগে তো বড় লোক হও—সোনাদানা হাতে আসুক —তখন না হয়—'

'আসতেই হবে—বড় লোক আমাকে হতেই হবে—' বিমলার কানের কাছে মুখ নিয়ে সুদাম আরো যেন কি বলল। আবেশে আহ্লাদে বিমলার চোখের পাতা বুজে এল।

সেই মুহূর্তে বিমলার ঘাড়ের ওপর দিয়ে সুদাম ভূষণ পোদ্দারের দোকানের তালা বন্ধ দরজাটা আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

সুদাম চোখ তুলতে পারছেনা।

শোভা মিটি মিটি হাসছে। দোতলার প্যাসেজের আলোটা তীব্র হয়ে জ্বলছে। আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে শোভা।

এভাবে সুদাম ধরা পড়ে যাবে বুঝতে পারেনি।

কিন্তু বুদ্ধিমতী বিমলা সব দিক রক্ষা করল।

'সেই কখন থেকে বসে আছে তোমার জন্য। বললাম, বেরিয়েছে এখনি এসে যাবে হয়তো। তা একটু দেরি করে ফেললে না?'

শোভা ঘাড় কাত করল ও ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। কিছু বলল না। কেবল চোখ বড় করে সুদামকে দেখতে লাগল।

'কোন হাউসে গিয়েছিলে ভাই? কি বই দেখে এলে?' বিমলা শোভার একটা আঙুল ধরে নাড়া দিল।

'মিনার্ভায়।' আড়ষ্ট শুকনো গলায় শোভা সংক্ষেপে বিমলার প্রশ্নের উত্তর দিল।

'কেমন আমি বলেছিলাম কি না।' বিমলা সুদামের দিকে চোখ ফেরাল। 'শোভা নিশ্চয় সিনেমায় গেছে—বা থিয়েটার দেখতে।'

একটু সাহস পেয়ে সুদাম শোভার মুখ দেখতে এদিকে চোখ ঘোরাল। শোভাও সুদামের চোখের দিকে তাকাল।

'পাশের বাড়ির বীণার সঙ্গে থিয়েটারে গিয়েছিলাম।'

'এখন আমি বুঝতে পারছি।' সুদাম এবার সহজভাবে কথা বলতে পারল।

'হ্যাঁ, ভাই, তুমি তো আমায় বলতে পারতে একবার—কখন টুক করে ওবাড়ির মেয়েটার সঙ্গে বেরিয়ে গেলে।' বিমলা অনুযোগের সুরে বলল, 'না কি আমাদের সাধ আহ্লাদ একেবারে মরে গেছে? বাহাত্তুরে বুড়ি হয়ে গেছি।'

'বুড়িরা সিনেমা থিয়েটার আমাদের চেয়ে বেশি দেখে।' হেসে শোভা বলল, 'কেন, কাল তোমায় বলেছিলাম কিনা, আজ থিয়েটার যাবার ইচ্ছে আছে—টিকিট পেলে যাব।'

'ও বলেছিলে নাকি—আমার ভাই একটুও মনে নেই।' ঈষৎ অবাক হবার ভাণ করে চতুরা বিমলা তৎক্ষণাৎ সুন্দর করে হাসল।

'তা ভাই এম্নি ঠাট্টা করছিলাম। আমার কি আর যাওয়া হত। শাশুড়িকে একলা রেখে কি করে থিয়েটার দেখতে যাওয়া চলে। কর্তারা কেউ বাড়ি নেই।'

'আমি তো জানি। সেইজন্যই কাল তোমায় তেমন করে বললাম না।'

'যাক গে—তোমার মনের মানুষটি অনেকক্ষণ বসে আছে। ফিরে যাচ্ছিল। বললাম, কতদিন পরে দেখা করতে এসেছ—দেখা করে যাও। শোভাও কদিন ধরে কেবল তোমার কথা বলছিল।' বিমলা আড়চোখে সুদামকে দেখে পরে আবার শোভার দিকে তাকাল। 'তা ভাই, এমন লাজুক ছেলে, কাঠের পুতুলটি হয়ে এতক্ষণ বসেছিল—বললাম একটু চা করে দি চা খাও—লজ্জায় মুখ তুলতেই পারছিল না।'

'এসো।' শোভা চিবুক নেড়ে সুদামকে ডাকল।

সুদাম আড়চোখে বিমলাকে একবার দেখে পরে শোভাকে অনুসরণ করল। সিঁড়ি ভেঙ্গে দুজনে ওপরে উঠে গেল।

বিমলা চুপ করে নীচে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

'কতক্ষণ এসেছ?' ঘরে ঢুকে শোভা প্রশ্ন করল।

'এই তো একটু আগে।' সুদাম মিথ্যা কথাই বলল। এতক্ষণ সে বিমলার ঘরে ছিল। এবং বিমলার কাছেই সে এসেছিল। শোভার কাছে আসে নি। আসত না। কোনদিন আর এ ঘরে আসার ইচ্ছা নেই তার। শোভাদের ঘরে দাঁড়িয়ে একথা সে আর বলে কেমন করে। বিমলার ঘর থেকে বেরিয়ে সে বারান্দায় পা বাড়িয়েছে এমন সময় শোভার সামনে পড়ে গেল। শোভা থিয়েটার দেখে সবে ফিরেছে। বিমলাদের একতলার বারান্দা পার হয়ে ওপরের সিঁড়ির দিকে ঘুরে যাচ্ছিল। শোভা সুদামকে দেখে চমকে উঠল। বিমলার ঘর থেকে হঠাৎ সে বেরোল কেন। ক'দিন

ধরে তো এ বাড়ি আসা সুদামের বন্ধ ছিল। আর শোভাকে হঠাৎ সামনে দেখে সুদামের মুখটাও কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল। যা হোক বিমলা তখনই চৌকাঠের বাইরে এসে শোভাকে বুঝিয়ে দিল, তাকে না পেয়ে সুদাম এঘরে অপেক্ষা করছিল। বিমলাই তাকে নিজের ঘরে বসিয়ে রেখেছিল। শোভা কি বিমলার কথা বিশ্বাস করল ?

এখন সুদামের মনে হচ্ছিল শোভা বিমলার কথা বিশ্বাস করেছে। তার তাকানো দেখে এবং গলার স্বর শুনে সুদামের আর এতটুকু সন্দেহ ছিল না। সুদাম তার জন্য এতক্ষণ নীচের ঘরের বৌয়ের কাছে অপেক্ষা করছিল। যেন এইজন্য শোভা একটু খুশিই হয়েছে। 'বোস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।' আঙুল দিয়ে শোভা একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, কদিন আসনি কেন ?'

'শরীরটা ভাল ছিল না।'

'কি হয়েছিল ?'

'এমনি—তা ছাড়া মনও ভাল ছিল না।'

'শরীর মন, সবই ভাল ছিল—আমি কি আর খবর পাই না। বাবা তো রোজ তোমাদের বাড়ি যাচ্ছে। সব খবরই কানে আসে।'

সুদাম চুপ করে রইল।

'না কি মান হয়েছে।' শোভা চুলের রিবনটা খুলে ফেলল। আজ সে একটু বেশি সেজেগুজে বেরিয়েছিল। পাশের বাড়ির বীণার সঙ্গে তার হালে খুব ভাব হয়েছে। যদিও বীণা কলেজে পড়ে কিন্তু তা হলেও মনে অহংকার নেই। শোভা মাত্র ফাইভ সিক্স পর্যন্ত পড়েছিল। তা সত্বেও শোভাকে বান্ধবীর মর্যাদা দিতে বীণা ইতস্তত করেনি। দুটি সমান বয়সের মেয়ের মধ্যে যত চট করে ভাব জমে ছেলেদের বেলায় যেন দেখা যায় না। এদিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মন বেশি জটিল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সুদাম এটা বুঝেছে। সে স্কুল ফাইন্যাল পাস করতে পারে নি।

আজ যারা কলেজে পড়ছে কি কলেজ থেকে পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে তারা সুদামের সঙ্গে মিশতে চায় না। বেশ একটু অহংকার নিয়ে তারা সুদামকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। অথচ কলেজে পড়া বীণার সঙ্গে শোভা দিব্যি থিয়েটার দেখে এল।

'কি হল চুপ করে রইলে যে!' হাতের রিবনটা দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রেখে শোভা সুদামের সামনে এসে দাঁড়াল। মোটা করে দু চোখে কাজল পরেছে। ভুরু দুটোও যেন একটু টেনে দিয়েছে। সুদাম ফ্যালফ্যাল করে শোভার মুখ দেখছিল, হঠাৎ তার মনে হল শোভা যেন একটু বেশি আধুনিক হয়ে উঠেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদাম আবিষ্কার করল, কাজল কুঙ্কুম পাউডার বা ঠোঁটে নখে রঙের ছড়াছড়ি যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি শোভার গায়ের গয়নার সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকম কমে গেছে। গলায় সেই মোটা দানার হারটা নেই। তার বদলে একটু সরু চেন দেখা যাচ্ছে। লকেটটাই যা একটু চোখে পড়ছে—না হলে মনেই হত না শোভার গলায় হার আছে। কানের রিং দুটোও নেই। হাতে আটটা করে চুড়ি ছিল। এখন এক হাতে দুটো মোটে চুড়ি। আর একটা হাত খালি। তবে একটা ঘড়ি রয়েছে।

যেন সুদাম একটু ক্ষুণ্ণ হল। একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মনে মনে দুঃখ হল। গা থেকে গয়নাগুলি শোভা খুলে ফেলল কেন। কলেজে পড়া বীণা মেয়েটার ওপর সুদামের রাগ হল। নিশ্চয় বীণা তাকে পরামর্শ দিয়েছে গায়ের গহনা কমিয়ে দিতে। না হলে যথেষ্ট আধুনিক হওয়া যাবে না। কিন্তু সুদাম তো তা চাইছে না। শোভার গায় ভর্তি গয়না থাকুক—আগে যেমন ছিল আজও থাকবে সে আশা করেছিল। এমন সুন্দর দামী গয়নাগুলি খুলে ফেলে মোটেই তোমায় ভাল দেখাচ্ছে না শোভা। সুদামের যেন বলতে ইচ্ছা হল। গয়না কম পরতে তারাই উপদেশ দেয় যাদের ওসব নেই। খোঁজ নিয়ে দেখগে সোনার জিনিস বলতে কটা জিনিস

বাগানের ঘরে আছে। তাই তারা ঘড়ি পরে মুখে পাউডার মেখে ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে শাড়ি পরে ও নানা ঢং-এ চুল বেঁধে বেণী ঝুলিয়ে ঘোরাফেরা করে। তাদের ভিতরটা ফাঁপা। ওপরটা রঙিন। তুমি কেন তাদের দলে মিশবে।

শোভা সুদামের হাত ধরল।

'চুপ করে রইলে কেন—'

সুদাম ফ্যালফ্যাল করে ওর গলার সুরু হারটাই দেখছিল। ভল্টুর কথা তার মনে পড়েছে। ভালবাসবে না—ভালবাসার ভান করবে।

কিন্তু আজ শোভার কথা ও চাউনিটা অন্যরকম লাগছে না ?

'আমি বেশ বুঝতে পারছি কেন তুমি আর আমাদের বাড়ি আসছ না।'

'কেন ?' সুদাম অল্প হাসল।

'ঐ যে, একটা কিছু উপহার চেয়েছিলাম—'

শোভা সেদিনের কথাটা মনে করিয়ে দিল। 'যা হোক একটা কিছু কাজটাজ জুটিয়ে নিতে বলেছিলাম—তাতেই তোমার অভিমান হয়েছে।'

সুদাম মাথা নাড়ল।

'মোটেই না। আমি কিছুই মনে করিনি সেদিন। তা ছাড়া তুমি ভাল কথাই বলেছিলে। তুমি যদি আমায় একথা না বলবে—এখন থেকে একটা দুটো উপদেশ না দেবে তো বলবে—কে।' সুদাম চমৎকার গুছিয়ে এত বড় মিথ্যা কথাটা বলতে পারল।

কিন্তু অবাক হল সে শোভার চোখ দেখে। কালো চোখ দুটো ছলছল করছে। ঠোঁট কাঁপছে। যেন খুব ব্যথা পেয়েছে ও।

সুদাম মনে মনে খুশি হল। মিথ্যা কথায় কাজ হয়েছে। তাই আবার নরম গলায় বলল, 'আমি ক দিন ধরে একটা কাজের চেষ্টা

করছি—তাই সময় পাই নি। না হলে তোমার কথা এক মিনিটের জন্যও ভুলিনি।'

'সত্যি ?' শোভা আবার সুদামের হাত ধরল।

সুদাম ওর কাঁধে হাত রাখল।

'তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—এক মিনিটের জন্য তোমার মুখ ভুলে থাকতে পারিনি। সারাক্ষণ কেবল তোমাকেই ভেবেছি। আর মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছি। কবে আমায় দিন দেবে। কবে আমি তোমাকে নিজের কাছে পাব। একটা কাজ জুটে গেলে, আর আমি কিছু ভয় করি না—তখন আমরা—'

সুদাম হঠাৎ থেমে গেল।

শোভার চোখ থেকে টুপ করে একটা জলের ফোঁটা ঝরে পড়ল।

'আমার কথা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। সেদিন তোমাকে কথাগুলো বলে পরে এত অনুতাপ হয়েছে—তারপর থেকে আর আমার মনে এতটুকু শান্তি ছিল না—ভাবলাম নিশ্চয় তুমি রাগ করেছ—অভিমান করছে। হয়তো চির কালের জন্যে তোমায় হারালাম—এই জানালা ধরে রোজ রাস্তাটা দেখতাম। সন্ধ্যে হলে বুকের ভেতরটা কেমন খাঁ খাঁ করত—বাড়িতে মন খারাপ থাকে বলে আজ ইচ্ছা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম—না হলে থিয়েটার দেখবার একটুও লোভ ছিল না আমার। একটি রিক্সা করে আমরা গিয়েছিলাম। চলতে চলতে বার বার রাস্তার দুধারের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়েছি—আর ভেবেছি যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়—কোথাও না কোথাও যদি তোমার মুখখানা দেখি—'

শোভা কথা শেষ করতে পারল না, ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সুদাম স্থির স্তব্ধ হয়ে রইল।

শোভা তার বুকের কাছে মাথাটা সরিয়ে এনেছে। এই সময়। এই সুযোগ। ভলটুর কথা আবার মনে পড়ল। মেয়েটাকে আদর করার চুমো খাবার ভান করে ওর গলার হারটা ছিনিয়ে নেবে।

একটা কথাও বলতে পারবে না সে, সে যে তোমার এত কাছে এসেছিল সোহাগ করে গায়ের ওপর ঢলে পড়েছিল আর তুমি তখন তার গায়ের গয়না ছিনিয়ে নিয়েছ একথা বাড়িতে কিছুতেই বলতে পারবে না মেয়ে— অথচ তোমার কাজ হাসিল হয়ে গেল। নিজের দোষ কাটাতে সে তার বাবার কাছে কি মায়ের কাছে অন্য কথা বলবে। মিথ্যা কথা বলবে। হারটা হারিয়ে গেছে—স্নান করার সময় বাথরুমে খুলে রেখেছিল, তারপর গলায় পরতে ভুলে গিয়েছিল। তারপর যখন মনে পড়ল তখন বাথরুমে গিয়ে দেখে হার নেই ইত্যাদি—

ভল্টুর পরামর্শ মনে থাকা সত্ত্বেও সুদাম যেন কেমন হয়ে গেল। ভালবাসার ভান করল সে। শোভার মাথায় চিবুকে হাত বুলিয়ে তাকে আদরও করল। কিন্তু হার ছিনিয়ে নিতে তার হাত সরল না; যেন শোভার চোখের জল তার মনটাকে হঠাৎ কেমন নরম করে দিল।

'কাঁদে না—ছি!' আস্তে বলল সে, 'আমি তো আবার এসেছি। আমি তো আছিই—চিরকাল থাকব।'

সান্ত্বনা পেয়ে শোভা মুখ তুলে তাকাল। চোখ মুছল।

'রাত হয়ে যাচ্ছে—আজ চলি।' সুদাম কপালের ঘাম মুছল। হঠাৎ সে কেমন ঘামতে আরম্ভ করেছিল।

'কাল আসবে?' শোভা কাতর চোখে তাকাল।

'আসব।' সুদাম ঘুরে দাঁড়াল। শোভার কান্নাভরা মুখটা দেখতে তার ভাল লাগছিল না।

'না এলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।'

চমকে উঠে সুদাম ঘাড় ফেরাল।

শোভা মিটি মিটি হাসছে। যেন কি একটা মতলব মাথায় এসেছে তাই এমন করে হাসছে।

'খারাপটা কি হবে শুনি?' হঠাৎ কেমন চিন্তিত হয়ে যেন প্রশ্ন করল সুদাম।

শোভা চোখ ফিরিয়ে দেওয়াল দেখতে লাগল। সরু কপাল। চাঁদের ফালির মতন পাতলা সুছাঁদ চিবুক। পাখির ডানার মতন দুটো ভুরু। মুহূর্তের জন্য সুদাম অভিভূত হয়ে গেল। তার ভয়ানক ইচ্ছা হল ওই মুখটা বুকের কাছে টেনে এনে আদর করে চুমো খায়। ভল্টুর পরামর্শ অবশ্য তখন তার মনে ছিল না, শোভার গলার হারের কথাও সে ভাবছিল না। কেবল ওই সুন্দর ভুরু কপাল চিবুক ও টলটলে চোখ দুটো তাকে টানছিল।

কিন্তু আশ্চর্যভাবে সুদাম ইচ্ছাটা জয় করল। কদিন আগে বুঝি এটা সম্ভব হত না। যেন এই কদিনের অভিজ্ঞতায় সে এধরণের কিছু কিছু লোভ ও ইচ্ছা সংবরণ করতে শিখেছে। বা বলা যায় কদিনের অভিজ্ঞতায় তাকে একটু বেশি সেয়ানা সাবালক করে দিয়েছে।

তাই শোভার কথা শুনে প্রথমটায় চমকে উঠেও পরে সে হাসতে পারল। দুশ্চিন্তাটা মন থেকে তাড়িয়ে দিল। হাল্কা গলায় বলল 'আমি আসব—তোমার ভয় নেই।'

তারপর আর সে দাঁড়াল না। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। নীচেটা অন্ধকার হয়ে আছে। বিমলাদের বারান্দার আলোটা নেভানো। বিমলার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বিমলাকে কি একবার ডাকবে? চিন্তা করে সুদাম সেই ইচ্ছাটাও দমন করল। বরং তার চেয়ে আজ চলে যাওয়া ভাল। কে জানে, যদি সিঁড়ির কোথাও শোভা দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো সুদামের চলে যাওয়া দেখছে। বিমলার ঘরে ঢুকলে এবার শোভা নিশ্চয় কিছু একটা সন্দেহ করে বসবে। তখন বিমলা বুদ্ধি করে নিজের ও সুদামের মুখ রক্ষা করেছে। হয়েতো এখনও বিমলা ইচ্ছা করেই বারান্দার আলো নিভিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে

দিয়েছে। মনে মনে আর একবার বিমলার বুদ্ধির প্রশংসা করে সে নিঃশব্দে দ্রুত পায়ে রাস্তায় নেমে এল।

পরদিন সকাল থেকে আকাশটা মেঘলা করে আছে। তেমন করে আলো ফুটল না। কেমন মনমরা ভাব নিয়ে দিন আরম্ভ হয়েছে।

তপা ও সুদাম তেঁতুলতলায় বসে আছে।

দু জনের মন খারাপ। সকালটার মতন তাদের মনও যেন অন্ধকার হয়ে আছে।

তপার সেই বন্ধুদা ধরা পড়েছে।

তাই তাদের দুশ্চিন্তা হয়েছে সিঁদকাঠীটা নিয়ে। সুদাম সেটা নিজের কাছে রাখতে সাহস পাচ্ছে না।

তপাও সেটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে কেমন গাঁইগুঁই করছে। তবু সুদামের একটা আলদা ঘর আছে। তপার তা নেই। এক ঘরে বাবা মা ও তারা চার ভাই বোন শোয়। সেখানে সিঁদকাঠি লুকিয়ে রাখার জায়গা নেই। বরং সুদামের ঘরে কেউ থাকে না। ওটা যদি তার সেই বেতের ঝুড়ির মধ্যে বইয়ের গাদার নীচে মাসের পর মাস পড়ে থাকে কেউ টের পাবে না—কেউ দেখবে না।

'কেন ওটা ওই গেঞ্জির কারখানার পেছনের ডোবাটায় ফেলে দিলে কি হয়।' সুদাম বলছিল।

কিন্তু প্রস্তাবটা তপার মনঃপূত হল না।

'ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। এটা হাতে থাকলে আমাদের সুবিধা হতে পারে।' তপা বোঝাতে লাগল। 'এমন একটা অস্ত্রের দাম আছে। এসব জিনিস দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না।'

কাজেই সুদাম দমে গেল। একটু চুপ করে থাকল। যেন তপার কথাটা চিন্তা করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে আবার মাথা নাড়ল।

'না ভাই পুলিশকে কিছু বিশ্বাস নেই। একটু গন্ধ পেলে কুকুরের মত ছুটে আসবে আমার ঘরে। আলমারী বাক্স খাটের

তলা সব জায়গা শালারা সার্চ করবে। বেতের ঝুড়িও উল্টে পাল্টে দেখবে। তখন মাল বেরিয়ে পড়বে। আর তখন হাতকড়া লাগিয়ে হিড় হিড় করে আমায় টেনে নিয়ে যাবে।' বলতে বলতে সুদাম কেমন শিউরে উঠল। যেন হাতকড়া পরিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যাবার দৃশ্যটা ঠিক চোখের সামনে দেখছিল।

সুদামের কথা শুনে ও তার মুখের অবস্থা দেখে তপা হেসে ফেলল।

'তুই ভয়ানক ভীতু!'

সুদাম চুপ থেকে আবার কি একটু ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার কাছে রাখতে পারি—কিন্তু ধরা পড়লে আমাকে সত্য কথাই তখন বলতে হবে—জিনিসটা কি করে আমার ঘরে এল পুলিশের কাছে গোপন করব না।'

তপার চোখ বড় হয়ে গেল। শুকনো একটা ঢোক গিলল।

'মানে তুই আগে ভাগে আমার নামটাই বলে দিবি—এই তো?'

তপা চটে যাচ্ছে লক্ষ্য করে সুদাম অস্বস্তিবোধ করল।

'আহা সেভাবে কি বলব—তুইও যে তোর বন্ধুদার জিনিসটাই এনেছিলি—বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য নিজের কাছে ওটা রেখেছিলি তারপর বাড়িতে রাখার অসুবিধা দেখে আমায় রাখতে দিয়েছিলি, গোড়াতেই আমি সব খুলে পুলিশের কাছে—'

'থাম থাম, গাধা!' তপা ধমক দিয়ে উঠল। তারপর যেন নিজের মাথার চুল ছেঁড়ার মতন একটা ভাব নিয়ে সুদামের চোখ দুটো দেখতে লাগল।

"কেন, সত্য কথা বলাই তো ভাল,' সুদাম বিড়বিড় করে বলল—'মানে তুই যে সিঁদকাঠির মালিক নস—তুই বা আমি এই জিনিস নিয়ে কারবার করি না—আমরা কেবল আর এক জনের জিনিসটা—'

এবারও তপা সুদামকে কথা শেষ করতে দিল না। হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'আরে গর্দভ এখানে বঙ্কুর নাম বললেই আর রক্ষা নেই। তখন তুইও বাঁচতে পারবিনে আমিও না। বঙ্কুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে ধরে নিয়ে পুলিশ আর কোন কথা না শুনে তুজনকে বেঁধে ফেলবে। তখন হাজার কান্নাকাটি করলেও, লাখ লাখ সত্য কথা বললেও রেহাই পাবি নে।'

'তা হলে উপায় ?' সুদাম বোকার মতন আবার প্রশ্ন করল। তপা বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়ল।

'পুলিশ তোর ঘরে আসবে না। যদি এসেই যায় ওটা গুম করতে এমন কিছু বেগ পেতে হবে না। এইটুকুন তো একটা অস্ত্র। পায়খানার নর্দমার ভিতর ঢুকিয়ে দিবি। পুলিশের বাবাও আর খুঁজে পাবে না।

হঠাৎ সেখানে ভল্টু এসে পড়াতে তুজন চুপ করে রইল।

কিন্তু ভল্টু তাতে মোটেই প্রসন্ন হল না। তুজন যেন ফিসফিস করে কি একটা পরামর্শ আঁটছিল। তাকে দেখে হঠাৎ এমন চুপ করে যাওয়াতে তার কেমন সন্দেহ হল।

বেশ কিছুক্ষণ তুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পরে ভল্টু লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আমি এসে তোদের অসুবিধায় ফেললাম দেখছি।'

'না না, অসুবিধা কেন।' সুদাম ভল্টুর হাত ধরল। বোস বোস—কি খবর ?

কিন্তু তথাপি ভল্টু গম্ভীর হয়ে রইল।

'তুই খামকা মন খারাপ করছিস ভল্টা।' এবার তপা ভল্টুর কাঁধে হাত রাখল। 'আমরা কেবল লাখ টাকার স্বপ্নই দেখে গেলাম—কোন কাজ করতে পারলাম না। সুদামকে এতক্ষণ তাই বলছিলাম।'

'কি করে আর পারবি।' ভল্টু ঠোট বেঁকিয়ে উত্তর করল। 'মেয়েমানুষ হয়ে ঘরে বসে থাকলে কোন কাজ হয় না।'

তপা চুপ করে গেল। সুদাম ঠিক এই জিনিসটাই আশঙ্কা করছিল। তপা কি আর অন্য কথা খুঁজে পেল না। ভল্টু এখনই তার উল্টাডাঙ্গার বন্ধুর কথা তুলবে, বৌবাজারে কোন গুণ্ডার সঙ্গে জানাশোনা আছে, তাকে ডেকে আনার কথা তুলবে। তারপর বলবে, মশা মেরে হাত কালো করব না। মারি তো হাতী লুঠি তো ভাণ্ডার। আর, অমুক কোম্পানীর তহবিল লুঠ করি. অমুক জুয়েলারী দোকানের মণিমাণিক্য কেড়ে আনি। অর্থাৎ লম্বা কথা ছাড়তে ভল্টুর জুড়ি নেই। সুদাম যা পছন্দ করে না। তপাও পছন্দ করে না ঃ তবে তপা কথাটা তুলল কেন? তপার ওপর সুদাম অসন্তুষ্ট হল।

কিন্তু আশ্চর্য, ভল্টু এর পর আর কিছু বলল না। মেয়েমানুষ হয়ে ঘরে বসে থাকলে কাজ হয় না বলে সে চুপ করল। যেন চুপ থেকে কি ভাবতে লাগল। বোঝা গেল বড় রকমের লুটতরাজের কথা আজ আর সে ভাবছে না। তার মাথায় অন্য চিন্তা। সুদাম মনে মনে খুশি হল।

'চলি সুদাম।' তপা কেটে পড়তে চাইছে। সুদাম বুঝতে পারল। সিঁদকাঠির ব্যাপারটা কিছু মীমাংসা হল না। যেন মীমাংসা করতে তপা রাজী নয়। তা ছাড়া ভল্টু এসে গেছে। এই নিয়ে এখন আর কথা হবে না। সুযোগ বুঝে তপা উঠে পড়ল। সুদাম চুপ করে রইল।

তপা সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেতে ভল্টু যেন একটু খুশি হল।

'তারপর তোর খবর কি!' ভল্টু সুদামের দিকে ঘুরে বসল। 'কাল গিয়েছিলি শ্যামবাজার?'

সুদাম ঘাড় কাত করল।

'দেখা হয়েছিল? বাড়িতে ছিল সে?' ভল্টু প্রশ্ন করল।

সুদাম এবারও ঘাড় নাড়ল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। ভল্টু হতাশ হল। সুদামের চোখ দেখে বুঝল কাজ হাসিল করতে পারেনি সে।

'তোর সঙ্গে এত মাখামাখি ছিল। একবারও কি কাছে ঘেঁসল না?'

'না,' সুদামকে মিথ্যা কথাই বলতে হল। 'এখনো মান ভাঙ্গেনি। দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলল। কাছে এল না।'

'তোকে দিয়ে কিছু হবে না।' ভল্টু তেঁতুল গাছের মাথার দিকে চোখ তুলে দিল। 'মেয়েছেলের মান ভাঙ্গাতে কতক্ষণ লাগে? একটু কাঁদোকাঁদো স্বরে কথা বললে ওদের মন ভিজে যায় বলেই তো আমি জানি।'

সুদাম কথা বলল না।

'ভাবলাম, অন্তত কানের একটা রিং যদি ছিনিয়ে আনতে পারতিস—আজ ওই সম্বল করে শৈলরাণীর কাছে যাওয়া যেত একটু ফুর্তি করা যেত।'

সুদাম চুপ করে রইল। যেন শৈলরাণী সম্পর্কে কাল তার যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেলেও আজ উৎসাহটা একেবারে নিভে গেছে। লক্ষ্য করে ভল্টু আবার গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ থেকে পরে বলল, 'আজ চমৎকার সুযোগ ছিল, বুঝলি সুদে, বাবার ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে পড়েছে। কাজেই আজ আর বেরোবে না। কাজেই আমরা সারারাত শৈলরাণীর ঘরে ফুর্তি করে কাটাতে পারতাম।'

সুদাম নীরব থেকে তেঁতুলের ডালে একটা কাঠবিড়াল দেখছিল।

ভল্টু বলতে লাগল, 'একদিন তোকে শৈলরাণীর ঘরে নিয়ে যেতে চাই। বাস্—তারপর এমন নেশা ধরে যাবে—রোজ ওখানে একবার ঢুঁ না মারলে ছটফট করবি, মনে হবে জীবনটা কিছু না, বেঁচে থেকে সুখ নেই।'

কিন্তু এবারও সুদাম কথা বলছে না। কেবল কাঠবিড়াল দেখছে। ভল্টু বিরক্ত হল।

'আজ আবার চেষ্টা করে ছাখ—বেশ মনটন গলিয়ে কথা বলবি, আরে, কথায় বলে ঘি আর আগুন—শালা আগুনের কাছে ঘি কতক্ষণ শক্ত হয়ে থাকবে জমে থাকবে? একটু আঁচ লাগার সঙ্গে সঙ্গে গলেটলে একাকার হয়ে যাবে! দেখিস।'

সুদাম চোখ নামিয়ে ভল্টুর মুখ দেখল।

'কি বললাম শুনতে পেলি?' ভল্টু তার থুতনি ধরে নাড়া দিল;

'শুনলাম—চেষ্টা করব।'

সুদাম অল্প একটু হাসল।

'নেশা ধরে যাবে—বুঝলি, একদিন শৈলরাণীর কাছে গেলে রোজ তোকে—' ভল্টু থামল। খড়মের ফটফট শব্দ করে দারোয়ান এদিকে আসছে।

ভল্টু উঠে দাঁড়াল।

'চললাম।'

সুদাম ঘাড় কাৎ করল।

সুদাম চিরকাল অঙ্কে কাঁচা। এক একটা অঙ্ক শুদ্ধ করে কষতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। হয়তো বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছে, তারপর শেষ দিকে অঙ্কটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। ফল আর মিলল না। হয়তো ক্লাসে মাস্টার-মশায় একটা অঙ্ক ব্লাকবোর্ডে নিজে কষে বুঝিয়ে দিলেন। সুদাম বারো আনা অংশ বুঝল, বাকি চার আনা অংশ কেমন ধোঁয়াটে হয়ে রইল—কিছুতেই সেটুকু আর সুদামের মাথায় ঢুকল না। অঙ্কের জন্য পরীক্ষা পাশ করতে পারল না।

আজ আবার সুদাম শুদ্ধ করে একটা অঙ্ক কষতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাচ্ছে গলদঘর্ম হচ্ছে—কিছুতেই ফল মেলাতে পারছে না। বারো আনা অংশ পরিষ্কার বুঝতে পারছে। বাকি চার আনা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে থেকে যাচ্ছে।

এই অঙ্ক ভূষণ পোদ্দারের মেয়ে শোভা ও নীচের ভাড়াটেদের বৌ বিমলাকে নিয়ে।

হয়তো সুদাম তরতর করে অঙ্কটা কষে যেতে পারত। কিন্তু শোভার চোখের জল সব কেমন গোলমাল করে দিল।

সুদাম মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল সিঁদকাঠি দিয়ে ভূষণ পোদ্দারের দরজা কেটে ভিতরে ঢুকে সোনা দানা চুরি করে আনবে। তার পর বিমলাকে নিয়ে দূর দেশে চলে যাবে। শোভা তো দূরের কথা নিজের বোন টগরের কথা বুড়ি ঠাকুমার কথাও সে ভাববে না। তারা তার কেউ নয়। বিমলাই সব। বিমলার মুখ মনে পড়লে সে আর সকলের কথা ভুলে যায়—ভুলে যেতে পারছে। বিমলার চোখ গায়ের রং ভুরু চুল শরীরের গড়ন তার এখন দিবারাত্রির চিন্তা। একলা চুপ করে কোথাও বসে থেকে সে যখন বিমলার কথা ভাবে তখন তার হৃৎপিণ্ড কেমন দুরদুর শব্দ করতে থাকে। তৃষ্ণা পাওয়ার মতন গলার ভিতরটা শুকিয়ে আসতে থাকে। মাথার ভিতরটা কেমন ঝিমঝিম করে। তার কিছুই ভাল লাগে না তখন। কারো সঙ্গে কথা বলতে এমন কি কারো মুখ দেখতে তার ইচ্ছা করে না।

কদিন ধরে এমন হচ্ছে।

কাল হঠাৎ শোভা কান্নাকাটি করল, তার হাত ধরে একথা সেকথা বলল। তাই সুদাম খুব অস্বস্তিবোধ করছে। কেমন একটা বড় রকমের অসুখে ভুগে উঠে ক্রমে সে সুস্থ হয়ে উঠছিল, গায়ে বল পাচ্ছিল, এটা ওটা খেতে আরম্ভ করেছিল, ঠিক সে সময় আবার হুড়মুড় করে অসুখটা তাকে আক্রমণ করল। সে বিছানায় শুয়ে

পড়ল। আবার আগের মতন বিকার ক্লান্তি অরুচি ও শরীরে মনে অকথ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হল। চোখের সামনে পৃথিবীর নিরানন্দ ছবিটা কেবল ভেসে বেড়াতে লাগল।

শোভা যদি এমন করে চোখের জল না ফেলত—হাত ধরে বার বার 'কাল এসো'—'আমাকে ছেড়ে যেও না' বলে অনুরোধ না করত তবে বোধ হয় সুদাম শান্তি পেত। কেন না বিমলার সঙ্গে মেলামেশার পর থেকে তার মন সেভাবেই প্রস্তুত হয়েছিল। শোভা তাকে আগের চেয়েও বেশি ঘৃণা করবে উপেক্ষা করবে অকর্মণ্য ভেবে নাক সিঁটকাবে। কথা বলবে না। অহংকারে চোখ ফিরিয়ে রাখবে। কিন্তু তা না করে সে খুব কতক্ষণ কান্নাকাটি করল, সুদাম আর ওর কাছে যাচ্ছে না বলে দুঃখ করল।

তাই সুদাম এখন ফাঁপড়ে পড়েছে। অঙ্কটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এখন সে কি করে? আগে যেমন শোভার চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকত আবার কি সে তা করবে? কিন্তু সেটা কি সম্ভব? তবে নীচের ভাড়াটেদের সেই বৌটির কি হবে! সুদামের ব্যবহারে সে কি ভয়ানক দুঃখ পাবে না? তার চোখের সামনে দিয়ে সুদাম ওপরে শোভার কাছে যাবে গল্প করবে ভালবাসাবাসি করবে। আর এদিকে বৌটি গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

ছবিটা মনে হতে সুদামের বুকের ভিতর হু হু করে উঠল। তা হয় না। হতে দেওয়া উচিত নয়। বরং শোভাই কাঁদাকাটি করুক, গালে হাত দিয়ে বসে ভাবুক। কথাটা সে চিন্তা করল। এবং এ-ও ভাবল, নীচের সেই বৌটি তার যত কাছে এসেছে এতদিন ভালবাসার সুতো জড়িয়ে জড়িয়েও শোভা তত কাছে আসতে পারেনি। কৈ, শোভার কথা চিন্তা করলে তো তার মাথা ঝিমঝিম করে না হৃৎপিণ্ড ফুলে উঠে না, তৃষ্ণা পাওয়ার মতন গলাটা শুকিয়ে যায় না। বরং শোভার কথা ভাবলে কতগুলি বাজে চিন্তাও সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় এসে ভিড় করতে আরম্ভ করে। যেমন চাকরির চিন্তা পয়সা

রোজগারের চিন্তা টগরের বিয়ের চিন্তা বুড়ির চিন্তা বাড়িভাড়ার চিন্তা এবং আরো কত কি সামাজিক নিয়ম বাধা নিষেধ কর্তব্য অকর্তব্যের ভারি ভারি সব ভাবনা। সুদাম ক্লান্তি বোধ করে। আজও শোভার কথা ভাবতে গিয়ে সে তেম্নি ক্লান্তি বোধ করছিল।

অথচ সেই বৌটির কথা যখন সে মনে করে তখন পৃথিবীর অন্য কোন ভাবনা চিন্তা তার কাছে ঘেঁষতে পারে না। তখন সে তার চোখের সামনে কেবল একটি মুখ দেখে একটি শরীর দেখে। তার মনে হয় তাদের দুজনের মাঝখানে আর কেউ নেই, আর কিছু থাকতে পারে না। তার মন কত হাল্কা হয়ে ওঠে তখন। ফাল্গুনের বাতাস লাগলে শরীর ঝরঝরে হয়ে ওঠে। বিমলাকে ভাবলে তার তাই মনে হয়। যেন ফাল্গুনের মিষ্টি হাওয়া গায়ে লাগল। যেন অনেক ফুলের গন্ধ সেই হাওয়ায় ছড়ান রয়েছে। পাখিরা কিচির মিচির করছে। আকাশটা গাঢ় নীল। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে আয়নার মতন চকচকে রোদ। অন্ধকার নেই। কোনদিন অন্ধকার হবে না। কোনদিন আকাশের নীল ফ্যাকাশে হয়ে উঠবে না। পাখির কিচির মিচির থামবে না। দুজনের গল্প ফুরিয়ে যাবে না। আর সেই চমৎকার আলোর পৃথিবীতে পাখির গান শুনতে শুনতে দুজন শুধু গল্প করে যাচ্ছে—চাকরি করা বাজার করা ভাত খাওয়া বাড়িভাড়া গোনা কি টগরের কথা বুড়ির কথা—কোন চিন্তা তাদের দুজনের মাঝখানে মাথা গলাতে পারবে না। সে এক আশ্চর্য সময়—আশ্চর্য জগত।

এখন সুদাম সেই জগতের কথা চিন্তা করছিল। আর স্থির স্তব্ধ হয়ে মাথার ওপর কচি তেঁতুল পাতার ঝিরঝির কম্পন দেখছিল। তার হৃৎপিণ্ড দুলছিল। সে যে একটি অঙ্ক কষতে বসেছিল তা ভুলে গেল। ভুলে থেকে শান্তি পেল। শোভাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেললে এত শান্তি পাওয়া যায় আগে সে জানত না। এখন জানল। শোভার চোখের জল দেখে আসার পর এটা সে ভাল করে বুঝেছে। কেউ

তোমায় ঘৃণা করলে তুমি তাকে পাল্টা ঘৃণা করতে পার বা উপেক্ষা করতে পার। কিন্তু কেউ তোমার জন্য চোখের জল ফেললে তোমাকে সেই চোখের জল মোছাতে অনেক কিছু করতে হবে। সেখানে তোমার দায় দায়িত্ব অনেক বেশি। একটা বোঝা তোমার মাথার ওপর চেপে রইল। সুদাম কোন বোঝা বয়ে বেড়াতে রাজী নয়।

তাই আর চুপ করে বসে না থেকে মন ঠাণ্ডা করে সে দাঁড়িয়ে শিস দিতে আরম্ভ করল। একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে মাথার ওপর কাঠবিড়ালটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। কাঠবিড়াল লেজ তুলে সরসর করে পালিয়ে গেল। সুদাম মনে মনে হাসল। শোভার ভাবনা সে এম্নি ঢিল ছুঁড়ে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সুদাম বাড়িতে ঢুকল। আকাশের মেঘলা ভাব অনেকটা কেটে গেছে। মাঝে মাঝে রৌদ্রের ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছে। আকাশ মাটি হেসে উঠছে। কিছুক্ষণ হাসিটা থাকল। আবার কোথা থেকে এক দঙ্গল মেঘ ছুটে এসে রৌদ্র নিভিয়ে দিল, আকাশের মুখ কালো হয়ে গেল। সেই মেঘ সরে যেতেও অবশ্য এখন আর বেশি সময় লাগছে না। আবার ঝলমলে আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

সুদামের ভাল লাগল। আকাশের একটানা থমথমে অন্ধকারটা তবু দূর হয়েছে বলা যায়। সারাদিন এমন মুখ গোমরা হয়ে থাকাটা কিছু না। মন খারাপ লাগে! সকাল থেকে তাই চলছিল।

এক ঝলক রোদ মাথায় নিয়ে সুদাম বাড়িতে ঢুকল। তার চোখে মুখেও একটা হাসির ঝলক ছিল। কিন্তু ভিতরের বারান্দায় পা দিতে তার মুখ কালো হয়ে গেল। ভূষণ পোদ্দারের গলা শোনা যাচ্ছে। দিনের বেলা এসময়ে পোদ্দার তো আসে না। আজ কি দোকান বন্ধ? কাজকর্ম নেই? নিজের ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সুদাম কান পেতে রইল। বুড়ির ঘরে ভূষণ কথা বলছে। যেন বুড়ির সঙ্গেই

কথা বলছে। টগর কি ওঘরে আছে ?.সুদাম এদিক ওদিক তাকাল। কলতলায় টগর নেই। অথচ কলে জল এসে গেছে। এখন টগরের বাসন কোসন ধোয়ার কথা, জল তোলার কথা। কোথায় ও ? নিশ্চয় ওখানে বসে ভূষণ পোদ্দারের কথা গিলছে—হাঁ করে ভূষণের মুখের দিকে চেয়ে আছে। রাগে সুদাম জ্বলতে লাগল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে চুল ধরে মেয়েটাকে হিড়হিড় করে ওঘর থেকে টেনে বার করে। স্কাউণ্ড্রেলটা দিনের বেলা আসতে আরম্ভ করেছে। তার মানে এখন থেকে যখন খুশি তখন সে এ বাড়িতে ছুটে আসবে। কেউ তাকে বাধা দেবার নেই। বাধা না দিলে এমন হবেই। দিন দিন শয়তানের লোভ বাড়ছে সাহস বাড়ছে। এখনই পাজিটাকে শিক্ষা দেওয়া যায় না! সুদামের মনে পড়ল তার তক্তপোষের নীচে একটা লোহার রড পড়ে আছে। জং ধরা সেই রডটা বার করে এনে সে সেটা নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকুক। তারপর এক সময় কুকুরটা ওঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসবে তখন আর কোনদিকে না তাকিয়ে অন্য কিছু না ভেবে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সুদাম তার মাথাটা দু ফাঁক করে দেবে। পঞ্চাশ বছরের বুড়ো ধাড়ির ষোল বছরের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা বার করে দেবে।

যেন জং ধরা লোহাটা তক্তপোষের তলা থেকে টেনে বার করে আনতে সুদাম ঘরে ঢুকছিল, স্থির হয়ে দাঁড়াল। বুড়ি খনখনে গলায় হাসছে। খুব খুশি হয়েছে বোঝা যায় সুদাম কান পেতে রইল। হঠাৎ বুড়ির এত আহ্লাদের কারণ কি

'লক্ষ্মী মেয়ে', ভূষণ বলছে, 'টগরকে তো আমি নূতন দেখছি না। এমন মেয়েকে যে স্ত্রী হিসাবে পাবে তার জীবন ধন্য হবে।'

বটে! সুদাম দাঁতে দাঁত ঘষল। মূল্যবান প্রস্তাবটা ·সরাসরি বুড়ির কাছে পেশ করতে ভর দুপুরে শয়তান এখানে ছুটে এসেছে।

'তা তো বুঝলাম ভাই।' বুড়ির গলা। 'কেবল ঐ লক্ষ্মীকে পেয়ে কি বর খুশি হবে—কিছু দেয়া থোয়ার কথা উঠলে তো গেছি

আমরা।' বুড়ি নাকি সুরে কেঁদে উঠল। 'যদি আমার কেতো আজ বেঁছে থাকত তবে কি আর রানীর মতন নাতনীকে সাজিয়ে দিতাম না—আমাদের পাঁচটা সাতটা মেয়ে না, ঐ একটি—'

'আ হা হা!' ভূষণের গলায় সান্ত্বনা ঝরে পড়ে। 'আমি তোমায় এতক্ষণ বললাম কি, কিছু চাই না—কিছু দিতে হবে না—কেবল শাঁখা সিঁদুর দিয়ে তুমি তোমার নাতনীকে সাজিয়ে দিও—বর তাতেই খুশি হবে—'

কাঁপতে কাঁপতে সুদাম ঘরে ঢুকল। নুয়ে তক্তপোষের তলা থেকে লোহার ডাণ্ডাটা টেনে বার করল। কেবল ঐ শয়তানটাকে না, বুড়িকেও আজ সে খুন করবে। সুদাম চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়াল। কলতলা দিয়ে টগর আসছে। সুদাম একটু অবাক হল। তা হলে টগর এতক্ষণ ওঘরে ছিল না। বাথরুমে ছিল। না হলে কি এমন একটা জঘন্য প্রস্তাবের প্রতিবাদ করত না কি ও?

না, তাই বা কেমন করে হবে। সুদাম তৎক্ষণাৎ হোঁচট খেল। টগর নিশ্চয় রাজী হয়েছে। না হলে ভূষণ এমন গলা উঁচিয়ে কথাটা পাড়তে সাহস পেত না। পিছনে টগর আছে বলে শয়তান এত জোর পাচ্ছে।

সুদামের ইচ্ছা করছিল টগরকেই আগে শেষ করে দেয়।

'এই শোন্ ইদিকে।' চাপা গলায় বোনকে ডাকল সে।

টগর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'কি বলছ!' ভাইয়ের চোখ দেখে টগর ভয় পেল। গলার স্বরটা কেমন অস্বাভাবিক। হাতে ওটা কেন! টগরের মুখ শুকিয়ে গেল। এগোতে সাহস পেল না। হাতের মগটা নামিয়ে রেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুদামও দ্বিতীয়বার তাকে ডাকছে না। যেন বিড়বিড় করে কি বলছে। এক মিনিট এভাবে কাটল। ওঘরে ভূষণ হাসছে। বুড়ি হাসছে।

'অঘ্রাণেই কাজটা সেরে ফেলতে চাইছি।'

'আমরাও চাইছি—শুভ কাজ যত শিগগীর—' যেন ভূষণ উঠে দাঁড়াল। আর কোন কথা নেই। কথা শেষ হয়ে গেছে। 'চলি দিদি'—

কোন দিকের দেওয়ালে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল।

সুদাম কি ছুটে গিয়ে ওঘরের দরজা আগলে দাঁড়াবে। ভূষণ পোদ্দার এখন বেরিয়ে আসবে। সুদাম কটমট করে সেদিক তাকাল। যেন টগর বুঝতে পারল। আর ভয় করলে চলবে না। ছুটে এসে সুদামের পথ রুখে দাঁড়াল।

'এটা হাতে নিয়ে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?'

'এম্নি।'

'না, এম্নি না। নিশ্চয় কোন মতলব আছে তোর।' টগরের চোখ জ্বলছিল। কেমন একটা হিসহিস্ শব্দ হল গলার। তার গলার স্বর ও তাকানো দুটোই এত অস্বাভাবিক অদ্ভুত মনে হল সুদামের যে সে রীতিমত চমকে উঠল। একটু যেন ভয়ও পেল। কোন মেয়েকে সে এভাবে তাকাতে এমন স্বরে কথা বলতে দেখে নি শোনে নি। সুদামের শক্ত মুঠ শিথিল হয়ে গেল। লোহার ডাণ্ডা হাত থেকে খসে পড়ল। বলতে কি, তার মনে হচ্ছিল, টগরের চোখ না একটা সাপের চোখ দেখছে সে। সাপটা ভীষণ রেগে গেছে। হিসহিস করছে। মাথা নীচু করে সুদাম কি একটা কথা ভাবল। তারপর টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে এল।

সুদামের চোখে জল এসে গেল।

রাগে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় তার বুকের ভিতর পুড়ে যাচ্ছিল।

টগরের স্বার্থে বাধা দিতে যাচ্ছিল সে। বুঝতে পেরে ও এমন রেগে গিয়ে ছুটে এল। যেন সুদামকে আক্রমণ করতে, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত নখ দিয়ে গায়ের চামড়া টেনে ছিঁড়ে ফালা

কালা করে দিত ওই মেয়ে। সুদামের বোন টগর না। আর কেউ। কেননা টগরের এমন ভয়ংকর মূর্তির সঙ্গে সুদামের পরিচয় ছিল না।

তাই সুদাম কাঁদছিল।

মায়ের পেটের ভাই গরের কাছে আজ কেউ না।

এ-বাড়ির বন্ধন এ-সংসারের স্মৃতি আজ ওর কাছে কিছু না। কেবল একটা স্বার্থ ওর চোখের সামনে, একটা মানুষ ওর মনের সামনে। পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ ভূষণ পোদ্দার। আহা, যদি কোন যুবক হত অল্প বয়সের একটি পুরুষ হত! এমন করে টগর নিজেকে ধ্বংস করবে, সুদাম এক এক সময় সন্দেহ করলেও তা যে সত্য হয়ে দাঁড়াবে সে কি জানত। এখন সে জানল। চোখের ওপর দেখল, টগর মরীয়া হয়ে উঠেছে। একটা বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছে ও—কোন কথা শুনবে না, কারো নিষেধ মানবে না। কেন? ভূষণ পোদ্দারের গহনার দোকান আছে বলে? তার ঘরের সিন্দুকে অনেক সোনাদানা?

কিন্তু তা বলে ভূষণের বয়সটা তো লুকোনো যাবে না।

মানুষ সুদামকেই প্রশ্ন করবে। তার বন্ধুরা জানতে চাইবে, পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই জিজ্ঞাসা করবে, এমন কচি বয়স টগরের, একটা বুড়োর হাতে তাকে তুলে দিলে কেন? তোমাদের কি রাস্তায় দাঁড়াবার অবস্থা হয়েছিল যে শেষটায় চোখে মুখে পথ না দেখে মেয়েটার এমন সর্বনাশ করলে। কি উত্তর দেবে তখন সুদাম! ইচ্ছা করে টগর ভূষণ পোদ্দারের ঘরণী হয়েছে বললে লোকে বিশ্বাস করবে? কেউ করবে না।

কাজেই সুদামকে মাথা নীচু করে থাকতে হবে। চিরদিন। এই লজ্জা কোন দিন সে ঢাকতে পারবে না, এই দুঃখ কোনদিন ভুলতে পারবে না।

চিন্তা করে তার বুক জ্বলে যাচ্ছিল, দু হাতে মাথাটা ধরে

রেখে মেঝের দিকে মুখ করে অসহায় শিশুর মতন সে কাঁদতে লাগল।

এখন আবার সুদাম কাঁদছে। বিমলার ঘরে আলোটা কমানো। সুদামকে সামনে নিয়ে খাটের ওপর বসে আছে বিমলা। বিমলার দুই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজে সুদাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সুদামের খোলা পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বিমলা। সান্ত্বনা দিচ্ছে।

'ছিঃ কাঁদেনা, পুরুষ মানুষ। তোমার কাঁদবার হয়েছে কি।'

'আমার ইচ্ছা করছে ভূষণের গলাটা কেটে দি। তার বুকে ছুরি বসিয়ে দি।'

'তা আর কেমন করে পারবে। মানুষ খুন করলে তোমার ফাঁসী হবে। খুন করে পালানো শক্ত।' বিমলা এবার সুদামের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। 'যদি ঐ বুড়োকে বিয়ে করে টগর খুশি হয় তো তাই করতে দাও। কে কি পেয়ে সুখী তা তোমার দেখবার কথা নয়। তুমি খামকা কেন মন খারাপ করছ, কেঁদে চোখ ফোলাচ্ছ। তুমি দেখবে তোমার সুখ কোথায়, তোমার সুখে যদি কেউ বাধা দেয় তখন তুমি রুখে দাঁড়াবে। কাজেই টগর কি করল না করল এই নিয়ে মাথা ঘামানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি।'

কান্না থামিয়ে সুদাম কথাগুলি শুনল। চুপ থেকে ভাবল।

'কথাটা ঠিক বললাম কিনা।' বিমলা এবার সুদামের চুলে আঙুল বুলোতে থাকে। 'সংসারে সবাই যখন নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে মত্ত তখন তুমিই বা তোমার স্বার্থ দেখবে না কেন। কাজেই বলছি টগরের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে তুমি নিজেকে দেখ—তোমার সুখ তোমার ভবিষ্যৎ।'

সুদাম একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। হাঁটুর ভিতর থেকে মাথা

তুলে দু হাতে বিমলার গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আমার সুখ তুমি, আমার —না, আর টগরের ভাবনা ভেবে মন খারাপ করব না, তুমি ঠিক কথাই বলেছ।'

বিমলা তার চুলের ভিতর তেম্নি আঙুল চালাতে লাগল। কথা বলল না।

যেন আবার একটু কি চিন্তা করল সুদাম। তারপর বলল, 'আমারই ভুল হয়েছে। সারাটা দিন মিছামিছি নষ্ট করলাম ওই একটা ভাবনা ভেবে। ধেৎ চুলোয় যাক টগর। শোন একটা কাজের কথা বলছি।'

'কি কথা!' বিমলা চোখ তুলল।

সুদাম ভূষণ পোদ্দারের দোকানের দরজাটা আঙুল দিয়ে দেখাল।

'ওটা ভাঙ্গতে হবে।'

'কেমন করে ভাঙ্গবে?' বুদ্ধিমতী বিমলা অবাক হল না চমকে উঠল না। 'ওদিকে ডবল তালা ঝুলছে।'

'দরজা কাটব। আমার কাছে যন্ত্র আছে।'

'তাই নাকি।' চাপা হাসি হাসল বিমলা। 'ভেতরে কলের সিন্দুক। ভয়ানক শক্ত শুনেছি।'

'তাও ভাঙ্গব। যন্ত্র দিয়ে কলের সিন্দুকও ভাঙ্গা যায়।' সুদাম সোজা হয়ে বসল।

বিমলা বলল, 'বা এমনও হতে পারে রাত্রে সব সোনা-দানা ওপরে তুলে নিয়ে যায় ভূষণ—'

'না, তা নেয় না—শুধু ক্যাশ নিয়ে যায় ওপরে। শোভা একদিন আমায় বলছিল। গয়না গাঁটি সব দোকানে পড়ে থাকে।'

'তা হবে।' বিমলা একটু ভাবল। 'কখন করবে সিঁদেল চুরি। তোমার দলে আর কে থাকবে?'

'কেউ না, তুমি। তুমি আর আমি। তোমার ঘরের ভিতর দিয়েই তো ভূষণের দোকানে ঢোকার পথ।' সুদাম আবার আঙুল দিয়ে বন্ধ দরজাটা দেখাল। 'ধর কাল রাত্রে এমন সময়? এখন কটা বাজে?'

'বারোটা হবে।'

'চমৎকার সময়। কালও তো তোমার স্বামী সোনারপুর থেকে ফিরছেন না?'

'মনে হয় না। শ্বশুর মশায়ের হঠাৎ অসুখ করল। তাঁকে সেখানে অসুস্থ ফেলে রেখে কেমন করে আসবে।'

সুদামের দু চোখ চক চক করে উঠল।

'তার মানে আরো তিন চারদিন তাঁরা সেখানে আছেন।'

বিমলা চুপ করে রইল।

'কাজেই এর মধ্যে আমরা কাজটা সেরে ফেলব। কিন্তু সেখানেই শেষ না। তারপর তোমায় নিয়ে আমায় দূরে কোথাও সরে পড়তে হবে।'

বিমলা চমকে ওঠার ভাণ করল।

'দূরে—কোন দেশে?'

'যেখানে হয়—বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠিক করব—ট্রেনে চাপবার পর চিন্তা করব কোথায় গেলে সুবিধা হবে।'

'কিন্তু যত দূরেই যাই—আমাদের পিছু পিছু পুলিশ ধাওয়া করবে।'

'কেন!' সুদাম আকাশ থেকে পড়ল। 'তুমি ইচ্ছা করে স্বামীর ঘর ছেড়ে আমার সঙ্গে যাচ্ছ—তোমায় ফুসলিয়ে ঘর থেকে বার করা হয়নি—তা ছাড়া তা ছাড়া—তুমি নাবালিকা নও—'

বিমলা অল্প শব্দ করে হাসল।

'তা বুঝলাম, কিন্তু কথা হচ্ছে, এখানে ভূষণ পোদ্দারের দোকানে এতবড় একটা চুরি হয়ে গেল। আমার ঘরের মধ্যে দিয়ে চোর দরজা

ভেঙ্গে দোকানে ঢুকল—তারপর থেকে আমি উধাও, এ বাড়িতে আর কোন পুরুষ আসে না, মাঝে মাঝে তুমি আসছ, আমার ঘরে ঢুকছ, কেউ জানছে না দেখছে না যদিও—ওপরে শোভার কাছে যেতে অনেকেরই চোখ পড়ে থাকবে—কাজেই পুলিশ ছুটবে তোমার বাড়ি—সেখানে পাবে না—তারপর কলকাতা শহরে কোথাও তোমায় খুঁজে পেলে না। এদিকে আমিও নেই—কাজেই তখন তোমায় আমায় জড়িয়ে পুলিশ চুরির তদন্ত আরম্ভ করবে—আর আমাদের দুজনকে খুঁজে বার করতে চারিদিকে গোয়েন্দা ছুটবে।'

সুদাম হাঁ করে তাকিয়ে থেকে কথাগুলি শুনল।

'তবে কি হবে?' একটু পরে আস্তে সে প্রশ্ন করল।

বিমলা হঠাৎ উত্তর করল না।

'আজ শোভা আবার যাতে দেখতে না পায় তাই একটু রাত করে এসে তোমার ঘরে ঢুকেছি। কাল অবশ্য দেখে ফেলেছিল।'

'তা আমি জানি। শোভাকে ফাঁকি না দিয়ে তুমি আমার কাছে আসবে কেমন করে। ওর সঙ্গে তোমার যখন ভালবাসা রয়েছে তখন—'

'আশ্চর্য!' বিমলাকে কথা শেষ করতে দিল না সুদাম। 'আবার তুমি ওই মেয়ের সঙ্গে ভালবাসার কথা বলছ। না, আর তাকে আমার ভাল লাগে না। তোমার সঙ্গে যেদিন থেকে পরিচয় হল সেদিন থেকে—না, তার আগে থেকে ভূষণ পোদ্দারের মেয়ে আমার চোখে বিষ হয়ে গেছে। কাল অবশ্য খুব কান্নাকাটি করছিল—কিন্তু আমার মন একটুও টলে নি। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। মা কালীর দিব্যি দিয়ে বলছি। তুমিই আমার সবটা মন কেড়ে নিয়েছ।'

বিমলা তার চুলে বিনি কাটতে লাগল।

'তবে তো মুস্কিল হবে।' সুদাম যেন ভয় পেয়েছে। 'পিছনে পুলিশ লেগে থাকলে কোথাও গিয়ে দুজন শান্তিতে থাকতে পারব

না—কেবল মনে হবে ঐ বুঝি আমাদের ধরতে এলো—আমরা ধরা পড়ে গেলাম।'

'তাই—আমিও তাই ভাবছি। এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে শান্তি নেই।' বিমলা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ভূষণকে খুন করলে যেমন বিপদ আছে তেমনি তার দোকানের সোনাদানা চুরি করারও অনেক বিপদ।'

'তা হলে আমরা কি করব?' সুদাম খুব একটা চিন্তায় পড়ল। 'টাকাকড়ি হাতে না থাকলে দূর দেশে আমরা যাব কেমন করে—এত এত টাকা ট্রেন ভাড়া পাবো কোথায়—তারপর কোথাও গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজ জোটান মুস্কিল হতে পারে—কদিন—তা ঠিক কত দিন বলাও যায় না—বসে বসে খেতে হতে পারে—বেশ মোটার কম পুঁজি না থাকলে উপোস করতে হবে।'

বিমলা ঘাড় কাত করল।

'বিদেশে পালিয়ে যাওয়ারও অনেক বিপদ—আমি সে কথাও ভেবেছি।' সুদামের মাথা থেকে হাত নামিয়ে বিমলা তার কোলের ওপর হাত রাখল। গলার স্বরটাও কেমন জড়ানো।

'তোমার ঘুম পেয়েছে।' বিমলার নরম হাতটা মুঠোর মধ্যে তুলে নিল সুদাম। 'শুয়ে পড়বে?'

'তুমি শোবে। এসো শুয়ে কথা বলি।'

দুজন এক বালিশে মাথা রেখে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। বিমলা হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিল।

'তা হলে দেখছি কিছুই হল না শেষ পর্যন্ত।' সুদাম অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিমলা সুদামের হাতটা বুকের ওপর টেনে নিল। অল্প হাসল।

'কেন, হল না কেন। আমি তো দেখছি সবই হচ্ছে—আমার কাছে যতক্ষণ থাকছ তোমার সব সাধ পূরণ করছি—তাই নয় কি?'

'সেকথা বলছি না।' বিমলার গলার ছোট্ট লকেটটা হাতে ঠেকল

সুদামের। আঙুল দিয়ে সেটা একটু নেড়ে চেড়ে বলল, 'ভাবছিলাম ভূষণকে জব্দ করব। যেমন একটা কচি মেয়েকে বিয়ে করল তেমনি দোকানে চুরি হয়ে ব্যাটা পথে বসল। ওদিকে আমাদের একটা মোটা পুঁজি হাতে এসে যেত বিদেশে যাওয়ার, বিদেশে থাকার।'

'থাক গে। মানুষের সর্বনাশ করা ঠিক না। কারো অনিষ্ট করে আমরা সুখী হতে চাই না। টগরকে বিয়ে করলে সে যদি সুখী হয় তবে তাকে তাই হতে দাও। আমরা আমাদের সুখ দেখব। তুমি কি আমার কাছে শুয়ে সুখী না?'

সুদাম নীরব থেকে মাথা নাড়ল। বিমলার বুকের কাছে তার মাথা, তাই মাথা নাড়া টের পেতে বিমলার কষ্ট হয় না, বিমলা খুশি হয়।

'খামকা হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে লাভ নেই—বুঝলে না? চুরি করা —বাড়ি ছেড়ে পালানো—দরকার কি আমরা দুজন এখন এভাবে যেমন আছি যদি সারাজীবন থাকতে পারি সেটাই পরম সুখ।'

'কিন্তু তোমার স্বামী যখন ফিরে আসবে?' সুদাম বিড়বিড় করে বলল, 'তখন কি আর এঘরে ঢুকতে পারব।"

'আহা, ফিরে আসবে—আবার বাইরেও যাবে। পুরুষ কি ঘরে বসে থাকে।'

'ওদিকে তোমার শ্বশুর আছে দেওর আছে একজন।'

'তারাও বাইরে যায়—তোমায় সেসব ভাবতে হবে না।' সুদামের গলা জড়িয়ে ধরল বিমলা। কপালে চুমু খেল [illegible] নেই। রোজ একবার করে যাতে আমার কাছে আসতে পার আমি সেই ব্যবস্থা করে দেব। বাড়ির পুরুষদের বাইরে যাওয়ার বাইরে থাকার সময় ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড আমার নখের ডগায়।'

'তুমি আশ্চর্য মেয়ে—' সুদাম আবার বিড়বিড় করে বলল। 'সব দিক বজায় রেখে চলতে জান।'

'তাই তো বলছি, তুমিও ঘরের ছেলে ঘরে থাক—আমায়ও ঘরের

বো ঘরে থাকতে দাও। বাইরে থেকে কিছু দেখা যাবে না বোঝা যাবে না—অথচ আমরা দুজন সুখে আছি, এই সুখের তুলনা নেই।'

'হুঁ।' কথাটা সুদামের ভাল লাগল। চুপ থেকে বিমলার গলার সরু চেনটা নিয়ে খেলা করতে লাগল, ছোট্ট লকেটটা আঙুল দিয়ে খুঁটতে লাগল। বিমলাও আর কথা বলছে না। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়ে এসেছে। যেন ঘুম পেয়েছে, এখনি ঘুমিয়ে পড়বে হয়তো। বাইরেটা নিবিড় নিঃসাড়। ভূষণের গহনার দোকানের টুকটাক ঠুকঠাক শব্দ অনেকক্ষণ থেমেছে। রাস্তায় আর গাড়ি ঘোড়ার শব্দ হচ্ছে না। শোভাদের ওপরটাও নীরব হয়ে আছে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়। সুদাম কান পেতে রইল। কেমন একটা শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। করাত দিয়ে কাঠ কাটার মতন শব্দটা। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে। কখনও গাঢ় হচ্ছে সেই শব্দ, কখনও মৃদু হয়ে আসছে। বিমলার শাশুড়ির নাক ডাকছে। বিমলা কাল বলছিল। এতে তার অনেক সুবিধা হয়। ঘড়ির এলার্মের কাজ করে শব্দটা। না হলে শাশুড়ি ঘুমিয়ে কি জেগে এঘর থেকে সে টের পেত না। কথাটা মনে পড়তে সুদামের হাসি পেল।

এদিকে দেখতে দেখতে বিমলাও ঘুমিয়ে পড়ল।

পরীক্ষা করতে সুদাম আলতো করে ওর মাথার চুল ধরে টানল। বিমলা আঃ উঃ করল না, নড়ল না।

এঘরে ঘুম ওঘরে ঘুম—ওপরে শোভারা ঘুমোচ্ছে। এই অবস্থায় আর এক ভদ্রলোকের বিছনায় তার স্ত্রীর সঙ্গে সুদাম শুয়ে আছে। ব্যাপারটা চিন্তা করে সুদামের কেমন অদ্ভুত লাগছিল। কিন্তু তা হলে হবে কি। সে আরো অনেক কিছু ভাবতে পারত। এই ঘর নিয়ে এই বিছানা নিয়ে। যার সঙ্গে শুয়ে আছে তাকে নিয়ে। অথচ হুট্ করে কিনা ভল্টুকে মনে পড়ে গেল। তপাকেও মনে পড়ল। তেঁতুল-তলার প্যাকিং বাক্সগুলি মনে পড়ল। কিন্তু সব চেয়ে বেশি মনে পড়ল ভল্টুকে। আর ভল্টুর সূতো ধরে তার বাবাকে মনে পড়ল।

খড়ম পায়ে, তুলসীর মালা গলায় উঁচু লম্বা ফর্সা মানুষটা। ভলটুর বাবাকে মনে পড়তে হাতীবাগানের শৈলরাণীর কথা মনে পড়ল সুদামের। আজও সে চোখে দেখেনি মেয়েটাকে, ভলটুর মুখে তার রূপের বর্ণনা শুনেছে। আগুনের মতন গায়ের রং। আগুনের ফুল। আগুনের ফুলটা কেমন হতে পারে সুদাম কতক্ষণ ভাবল। অন্ধকারে বিমলার ঝাপসা মূর্তিটাও সেই সঙ্গে সে বার বার দেখল। যেন ভলটুর মুখে শোনা শৈলরাণীর সঙ্গে সে বিমলাকে তুলনা করতে লাগল। এই বৌটির চেয়ে দেখতে ফর্সা শৈলরাণী? এর চেয়ে বেশি নরম হাতীবাগানের মেয়ের শরীর? কেমন একটা সমস্যায় পড়ল সুদাম। তার কপাল রীতিমত ঘামতে লাগল। এমন সমস্যায় সে কোনদিন পড়েনি। দুটো শরীরের মধ্যে কোন শরীরটা দেখতে ভাল। হাত দিয়ে ধরলে কারটা বেশি নরম ঠেকবে। অঙ্ক কষতে গিয়ে যেমন সে ফাঁপরে পড়ত এখন আবার তেম্নি ফাঁপরে পড়ল। কিছুতেই সে অঙ্কটা মেলাতে পারছিল না। ভলটুর বাবার শৈল-রাণী ও এই বৌটি তার মাথার ভিতর কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তার জট পাকানো ভাবনার সঙ্গে প্রেম ভালবাসা বিয়ে সন্তানের জন্ম ইত্যাদির সম্পর্ক নেই। কেবল দুটো শরীর। চামড়ার রং। মাংসের পেলবতা, রক্তের উত্তাপ। সুদামের মাথাটা ক্রমেই গরম হয়ে উঠতে লাগল। কপালের দু পাশে রগ টিপটিপ করতে লাগল।

হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ল। অঙ্ক কষতে বসে এমন অসুবিধায় পড়লে অনেক সময় চোখ মুখ বুঁজে ধাঁ করে বইয়ের পিছন দিকের পাতা উল্টে ফলটি দেখে নিয়েছি। তাতে কিছুটা সুফল পেয়েছে।

কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ড দুরদুর করতে আরম্ভ করল। তবে এখন পাতা উল্টে ফলটা দেখে নিতে দোষ কি। না হলে সমস্যার সমাধান হবে না। অঙ্ক মিলবে না। তাই আর দ্বিধা সঙ্কোচ না করে আবার সে বিমলার মাথার চুল টানল কোমরটা

একটু নেড়ে দিল। এবার বিমলা আঃ করে একটু শব্দ করল কিন্তু চোখ খুলল না, বরং পা দুটো টান করে একটু বেশি করে ছড়িয়ে দিয়ে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করল, এবং সুদাম অবাক হল শাশুড়ির মতন তারও নাক ডাকছে। ভাল, সুদাম খুশি হল, এ ঘরেও একটা এলার্ম দেওয়া ঘড়ি রয়েছে। কাজেই আর সে চিন্তা করল না, দেরি করল না, চুমু খাবার মতন তৎক্ষণাৎ বিমলার বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে লকেট সমেত গলার হারটা ছিঁড়ে ফেলল। আলগোছে গলা থেকে সেটা আলগা করে নিয়ে পকেটে পুরল।

তার পর অত্যন্ত সাবধানে সে তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়াল ও অন্ধকারে পা টিপে টিপে দরজার কাছে সরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ছিটকিনিটা খুলে ফেলল। ক্যাঁচ করে একটু আওয়াজ হল। কিন্তু সেটা কিছু না। ঘুমোলে যাদের নাক ডাকে এই সামান্য শব্দে তাদের ঘুম ভাঙ্গে না।

হৃষ্ট মনে সুদাম ঘর থেকে বেরিয়ে সরু বারান্দা পার হয়ে গলির দিকের কাঠের দরজার হুড়কা খুলে রাস্তায় নেমে এল। বিমলার শরীর বড় নরম গায়ের চামড়া অতি মসৃণ উজ্জ্বল। এই দুদিনে সে জেনে গেছে। এখন শৈলরাণীকে জানতে হবে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে গহনাটা অনুভব করল সে। না হলে জট পাকানো ভাবনাটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। মাথাও ঠাণ্ডা হবে না।

চিন্তা করে সুদাম রিক্সা ডাকতে এদিক ওদিক তাকাল। এত রাত্রে আর ট্রাম বাস পাবে কোথায়।

দাঁত পড়া মাড়ি বের করে বুড়ি হাসছে। একটু দূরে বসে ঠোঁট টিপে টিপে টগর হাসছে। আজ তারা রাগ করছে না সুদামকে দেখে। বরং যেন খুশি হয়েছে। অথচ সারা রাত বাইরে কাটিয়ে সকালে সুদাম বাড়ি ফিরেছে। সারা রাত কেন, বলতে গেলে কাল দুপুরের পর থেকেই তো সে বাড়ি ছাড়া। ভূষণকে মারবে বলে লোহার ডাণ্ডা হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়ানো, তারপর টগরের কটমটে চাওনি দেখে হাতের ওটা ফেলে দিয়ে নিজের ঘরে এসে কাঁদা, তারপর চোখ মুছে জামা চড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। ছবিটা সুদামের এখন মনে পড়েছে। বিশেষ করে টগরের এখনকার চেহারা দেখে কাল দুপুরের ঘটনাটা তার বেশি মনে পড়েছে।

কিন্তু টগরকে হাসতে দেখে সে রাগ করল না।

'চা করে দে।' হাল্কা গলায় সে কথা বলল। টগর চা করতে বেরিয়ে গেল।

'বলি, তুই কি ঘোড়ায় চেপে বোনকে চায়ের হুকুম করছিস—বসতে পারিস না।' ঠাকুমা হেসে একটা ধমক দিল।

সুদাম তাতেও রাগ করল না।

'আমার বসবার দরকার কি—আমি তো তোমাদের সংসারের কেউ না।' অভিমান থমথমে গলায় সে উত্তর করল। 'সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস, তাই বললাম। ইচ্ছা হয় করে দেবে—না হয় বাইরে গিয়ে খাব।'

'কেন—' বুড়ি আর এক দফা হাসল। 'বাইরে চা খাওয়ার হয়েছে কি—বলি এত যে বাইরে বাইরে করিস— সারাদিন কেবল বাইরে ঘুরিস—এদিকে সংসারটা দেখে কে—আর একটা পুরুষ আছে বাড়িতে?'

'আছেই তো।' সুদাম রুখে উঠল। 'তোমাদের সংসার দেখতে ভূষণ আছে না?'

'তা আছে'— বুড়ির মুখের হাসি নিভল না। 'কুরের কৃপায় ভূষণের মতন ভাই পেয়েছি বলে না আজ আমার এমন উপকার করল।'

'উপকার!' সুদামের গলা ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছা করল। বুড়ির গলা টিপে ধরে চিরকালের মতন তার মুখের কথা থামিয়ে দেবে কি না তাও সে ভাবল। কিন্তু সেসব কিছু করল না সে। চুপ থেকে মনে মনে বলল, 'উপকারই বটে—নাতজামাই হচ্ছে, তুমি মরলে এই ভূষণই তো তোমার মুখে আগুন দেবে শ্রাদ্ধশান্তি করবে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দেবে। এমন উপকার কজন করে!' সুদাম দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল।

'কাল তো সারাদিন তোর ছায়াটা আর দেখতে পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ বসে থেকে ভূষণ চলে গেল।'

'কেন, আমায় দিয়ে তার দরকার কি—আমি এ বাড়ির কে?' সুদাম আবার গজগজ করে উঠল।

'এই দ্যাখ—কথাটা বলতে দেয় না, অমনি রেগে গেল।' বুড়ি কাতর চোখে তাকায়। 'কেন, তুই এবাড়ির কেউ না কে বললে—তুই হলি আমার বংশের আলো—এবাড়ির পুরুষ বলতে তুই ছাড়া আর কেউ আছে?'

আবার সুদামের গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা হল। বুড়ির টুঁটি চেপে ধরবে কি না ভাবল।

'তুই বড় ভাই—টগর তোর মার পেটের বোন। টগরের বিয়ের ব্যাপারে ভূষণ তোর সঙ্গেও যে দুটো কথা বলতে চাইছিল।'

'কিছু দরকার নেই।' সুদাম মাথা ঝাঁকাল। 'বেকার বাউণ্ডুলে। আমার আবার একটা দাম কি সংসারে। তোমার সঙ্গেই তো সব কথা বলা হয়ে গেছে—তুমি যখন রাজী হয়েছ তখন আর—'

চা নিয়ে টগর ঘরে ঢুকল।

সুদামের কথা থেমে গেল।

দাদার সামনে চায়ের বাটি নামিয়ে রেখে টগর ঠাকুমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি কার সঙ্গে এত কথা বলছ ঠাকুমা। ভূষণদাদাকে কাল মেরে ফেলবে ঠিক করে রেখেছিল ও। বলে টগর সুদামের মুখটা এক নজরে দেখে আবার তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

'কেন, বলিস কি!' বুড়ি আকাশ থেকে পড়ল। দন্তহীন কালো মাড়ি ছুটো মেলে দিয়ে এত বড় একটা হাঁ নিয়ে একবার টগরকে একবার সুদামকে, দেখতে লাগল। তারপর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'এমন সুহৃদ সংসারে কটি আছে। বাপ নেই মা নেই তোদের। তোর একটা কাজের সুবিধা হল না, আজও মেয়ে-টাকে পাত্রস্থ করলে না হয়। তাই না ভূষণ গরজ করে এমন আলাপটা নিয়ে এল। তার ভায়রা কানাই সামন্তর মেজ ছেলে অনিল। বড়বাজার কাপড়ের গদীতে লেখা পড়ার কাজ করে। একটা পাশও দিয়েছে। বাইশ তেইশ বছর বয়স। নিজেদের বাড়ি আছে ভদ্রকালীতে। এমন সম্বন্ধ আমি কোথায় পাব। এক পয়সার দাবী দাওয়া নেই। ভূষণ যে আমার কত বড় মিত্রের কাজ করে দিচ্ছে কত বড় বোঝা আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে দিচ্ছে তা আমি জানি।'

সুদামের মুখের পেশী হঠাৎ ঢিলে হয়ে গেল। চোখ ছুটো গোল হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে কেমন যেন বোকা হয়ে গিয়ে বুড়িকে দেখতে।

'কেন কারণ কি, ভূষণের ওপর তুই এত চটা কেন।' বুড়ির শুকনো কপাল বড় বেশি কুঁচকে উঠল। 'তোদের উপকার করছে বলে—রোজ একবারটি করে এত দূর থেকে টেরাম ভাড়া দিয়ে

খবর নিচ্ছে বলে?' বুড়ি টগরের দিকে মুখ ঘোরাল। 'কি টগর, কথাটা বলে তুইও চুপ করে গেলি যে। আমায় খুলে বল না, ভূষণের ওপর ওর এত রাগ কেন? ছি ছি—এমন দয়ার শরীর এমন মন—এত ভালবাসা, তোদের এত স্নেহ করে—আর এই সোনার মানুষটাকে কিনা—টগর আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—সুদের মাথায় কি ভূত চেপেছে যে ভূষণের মতন মানুষকে ও বিষ নজরে দেখে।'

'তুমি ভাল করে জিগেস কর—আমি কি করে বলব কেন ও ভূষণদাকে দু চোখে দেখতে পারে না।' এবার টগর হাসল না। বরং একটু গম্ভীর হয়ে স্থির শান্ত চোখে নিজের হাতের নখগুলি দেখতে লাগল।

'কেবল কি টগরের বিয়ের আলাপ—ভূষণ কাল তিনবার আমার হাত ধরে বলেছে, তুমি কিছু ভেব না দিদি, সব ঠিক হয়ে যাবে। সুদাম এখনো ছেলেমানুষ। অস্থিরমতি। ওর মন স্থির হোক। আমার দোকানে ঢুকিয়ে দেব। আমি নিজের হাতে ওকে গহনা গড়ার কাজ শেখাব। আর আমার মনে যা আছে তোমায় অনেক দিন আগেই বলে রেখেছি—' বুড়ির চোখে জল এসে গেল। বাঁ হাত দিয়ে জলটা মুছে ফেলে থুতনি নেড়ে সুদামকে ডাকল, 'আয় শোন, তুই আমার কাছে আয় ভাই—আমার হাতটা একবার ধর—আমি আর কদিন বাঁচব। তোরা সুখে শান্তিতে থাক—রাত দিন ঠাকুরকে ডাকছি।'

'যা না, ঠাক্‌মার কাছে যা।' পিছন থেকে টগর বলল। কিন্তু সুদাম নড়ল না। পাথরের মতন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ তুলতে পারছে না সে। তার ঠোঁটের কোণা কাঁপছে। যেন কান্না পেয়েছে। অথচ কাঁদতে পারছে না।

'ভূষণদার সেই কথাটা দাদাকে বলে দাও ঠাক্‌মা।' টগর ফিক করে হেসে ফেলল। 'তা হলে ও কাজে লেগে যাবে, আর বসে না থেকেই ভূষণদার দোকানে যেতে আরম্ভ করবে ছ্যাখো।'

এবার সুদাম চমকে উঠল। যেন একটা কিছু অনুমান করল। অনুমানটা সত্য কিনা পরীক্ষা করতে মুখ তুলে টগরের চোখের দিকে তাকাল। কিন্তু টগর চালাক মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ঠোঁট টিপে হাসছে।

'বুঝলি সুদে—' ঠাকুমাও এখন মিটিমিটি হাসল। 'ভূষণের খুব ইচ্ছে, শোভা এবাড়ির বৌ হয়ে আসুক—অনেক দিন আগেই আমায় কথাটা বলে রেখেছে।'

টগর আর দাঁড়াল না। শব্দ করে হেসে উঠে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

কিন্তু তথাপি সুদাম গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'না না, এসব হবে না—আমার কাছে এসব আব্দার খাটবে না। আমি বিয়ে করব না। আমি এই সংসারে থাকব না। অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি। তোমরা সুখে থেকো—তুমি আর তোমার ঐ আদুরে নাতনী—ইস্ বিয়ের নামে মেয়ের প্রাণে আহ্লাদের তুফান উঠেছে—হাসি আর থামছে না--' এক সেকেণ্ড চুপ থেকে পরে তেম্নি গলা ফাটিয়ে সে বলিল, 'হুঁ, আমি ঢুকব ভূষণের দোকানে—আমি হব তার কর্মচারী —বয়ে গেছে—'

দুপদাপ করে ঠাকুমার ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। টগরকে দেখতে পেল না। যেন দেখতে পেলে আবার সে চিৎকার করে বলে উঠত : 'এই অসভ্য মেয়ে—কাল তুই আমায় এসব বলিস নি কেন—এত দিন বলিস নি কেন। চুপ করে থাকলে আমি কি করে জানব যে ভূষণ আসলে খারাপ মানুষ না—এ বাড়িতে সে ভাল মন নিয়ে আসে—ভূষণ বাড়িতে ঢুকলে আমি কতদিন রাগারাগি করেছি —কিন্তু তুই কি তখন মুখ ফুটে বলতে পারতিস না যে—'

রাগে দুঃখে অপমানে সুদামের চোখে জল এসে গেল। নিজের ঘরে না ঢুকে সোজা সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কোথা থেকে একটা ঘেয়ো কুকুর এসে একটা কাঠের বাক্স জুড়ে বসেছে। অন্য দিন হলে সুদাম লাথি মেরে ওটাকে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু আজ তার পায়ে জোর নেই। পা হাত যেন অবশ হয়ে গেছে। কুকুরটাকে সামনে রেখে সে আর একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল। তেতুল পাতার ফাঁক দিয়ে সোনার টুকরো হয়ে রোদ ঝরে পড়ছে। কুকুরের ঘায়ের জায়গাটায় মাছি ভনভন করছে। সেখানেও এক টুকরো সোনালী রোদ এসে পড়েছে। সেদিনের ছুঁচোটা একটা বাক্সের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সুদামের পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করতে লাগল। ভয় ডর নেই। যেন ওটাও বুঝে গেছে সুদাম আজ কিছু করবে না। তার সব তেজবিক্রম চলে গেছে। অন্য মানুষ হয়ে গেছে সে।

সুদাম চুপ করে বসে ভাবছিল। সত্যি কি সে অন্য মানুষ হয়ে গেছে? না, সংসারটা অন্যরকম হয়ে গেছে—পৃথিবীর চেহারাটা বদলে গেছে। সুদাম এক রকমই আছে। তার নিজের দিক থেকে কোন পরিবর্তন নেই। অথবা এমনও হতে পারে পৃথিবীও বদলায় নি, মানুষও আগের মতন আছে। সুদামের এত দিন দেখাটাই ভুল হয়েছিল। দেখার ভুল বোঝার ভুল। ভূষণকে সে ভুল বুঝেছে, ভুল চোখে দেখেছে। টগরকেও। আর যেমন তেমন ভুল না। যেটা সে এতকাল কালো মনে করত সেটা কালো না—তার উল্টো। একেবারে সাদা।

সাদাকে কালো দেখা। তার অর্থ সুদামের মন কালো দৃষ্টি কালো। মনে পাপ থাকলেই এমন হয়। সব কিছু কালো দেখা যায়। সব মন্দ মনে হয়।

কথাটা চিন্তা করে সে ভয়ানক অশান্তি বোধ করছিল। কিছু

ভালো লাগছিল না তার। নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল।

সংসার নিয়মের পথে চলেছে। আর সুদাম চলছিল নিয়মের বাইরে। তাই এমন করে সে হোঁচট খেল—হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

সুদামের মনে হচ্ছিল আর সে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারবে না। ভূষণের দোকানে কাজ শিখতে যাবে? ভূষণের সামনে দাঁড়াতে যে তার লজ্জা করবে। তা ছাড়া সে ভূষণের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল না? দোকানের সোনাদানা সরানো মানে লোকটাকে পথে বসানো।

হ্যাঁ, এত পাপ ছিল তার মনে।

কাজেই এই মন নিয়ে সে শোভাকে বিয়ে করবে কোন লজ্জায়। শোভার উপযুক্ত না সে। টগরের কাছে ভূষণের কাছে যেমন সে ছোট হয়ে গেছে তেম্নি শোভার কাছেও সে ছোট হয়ে গেল।

তবে কি এই সংসারে তার কোন মূল্য নেই—কেউ তাকে ভাল চোখে দেখবে না, ভালবাসবে না? ভেবে তার বুকের ভিতরটা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে আলোর রেখা দেখলে মানুষের মনে যেমন আশা জাগে সুদামের চোখের সামনে একটি মুখ ভেসে উঠতে সে একটু আশ্বস্ত হল। পৃথিবীর সবাই তাকে ঘৃণা করে কিন্তু একজন তাকে ভালবাসে বিমলা। বিমলাকে মনে পড়তে সুদাম মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসল। তার শিথিল অচল স্নায়ু সতেজ হয়ে উঠল। মুখের বিষাদ ভাবটা দূর হোল। কুকুরটা দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। মাছিগুলি চঞ্চল হয়ে উড়তে আরম্ভ করেছে। ভক্ করে ঘায়ের দুর্গন্ধটা সুদামের নাকে লাগল। একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুঁড়ে মারল। কুকুরটা কাঁইকুঁই শব্দ করে লেজ গুটিয়ে দূরে সরে গেল। মানুষটা এখন তাজা হয়ে উঠেছে। এবার তাকেও তাড়া করবে বুঝতে পেরে ছুঁচোটা তাড়াতাড়ি একটা

বাক্সের ভিতর ঢুকে পড়ল। সুদামের গুনগুন করে গান করতে ইচ্ছা করছিল। ছেলে বেলায় শোনা সোনার কাঠি রূপোর কাঠির গল্পটা তার মনে পড়ল। রূপার কাঠি ছুইয়ে রাজকন্যাকে ঘুম পাড়ানো হত আর সোনার কাঠি কপালে ছুঁইয়ে তাকে জাগানো হত। বিমলার মুখের ছবিটা যেন সোনার কাঠি। এতক্ষণ সুদাম ঘুমিয়ে ছিল মরে ছিল। এখন সেই সোনার কাঠি তার মন ছুঁয়েছে কি সে জেগে উঠল, সজীব হয়ে উঠল। আর কোন অবসাদ নেই অস্থিরতা নেই ভয় নেই দুর্ভাবনা নেই। আজও বিমলার স্বামী বাড়ী ফিরছে না। সুতরাং—

ভাবতে আরম্ভ করে সুদাম সঙ্গে সঙ্গে আবার নিস্তেজ ম্রিয়মান হয়ে গেল। কাল রাত্রের কথা তার মনে পড়ল। জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিমলার গলার সরু হারটা অনুভব করে তার হাতের আঙ্গুলগুলি কেমন অসাড় হয়ে গেল। মেরুদাড়ায় একটা শীতলতা অনুভব করল সে। না, সেখানেও আর তার যাওয়া চলবে না। বিমলার গলার অলঙ্কার চুরি করেছে সে। চোরকে সবাই ঘৃণা করে। বিমলা তাকে ঘৃণা করবে।

দু হাতে সে মুখ ঢাকল। আবার তার চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। তার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

'এই, কি করছিস?'

সুদাম চমকে উঠে ঘাড় তুলে তাকাল। ভলটু দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো লাল। মুখটা ফোলা ফোলা। যেন সকালেই ভলটু মদ খেয়ে এসেছে।

'কি ভাবছিস একলা বসে বসে?' ভলটু ধপ্ করে সামনের বাক্সটার ওপর বসে পড়ল।

সুদাম অল্প হাসল। ভলটুকে দেখে তার ভাল লাগছে। আবার যেন সে আলোর রেখা দেখেছে বুকে আশা জেগেছে। অন্তত এক জন তার পাশে আছে। একটি বন্ধুকে সে হারায়নি।

'তারপর ? গিয়েছিলে কাল ?' ভল্টু প্রশ্ন করল।

সুদাম তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল।

'তোর কাছেই তো এখন যাব মনে করেছিলাম।'

ভল্টুর চোখ দুটো বড় হয়ে গেল। মুখে হাসি জাগল।

'তা হলে কাজ হাসিল হয়েছে ?

সুদাম আবার ঘাড় কাত করল।

'নিশ্চয়, না হলে আর তোর কথা ভাবছিলাম ?'

'কই, দেখি, এনেছিস জিনিসটা সঙ্গে ?' ভল্টু ব্যাগ্র হয়ে হাত বাড়াল।

সুদাম পকেট থেকে কাগজের পুরিয়াটা বার করল।

"একটুখানি জিনিস—ছোট গয়না।' মিনমিনে গলায় ভল্টু বলল। সুদাম চুপ করে রইল। পুরিয়া খুলে হারটা বার করল।

'আজই এটা কোন সোনার দোকানে বেচে দিতে হবে।' ফিস ফিস করে সুদাম বলল, 'আজ সন্ধ্যেবেলায় আমরা শৈলরাণীর কাছে যাব।' কিন্তু ভল্টু কথা বলছে না। হঠাৎ বড় বেশি চুপ হয়ে গেছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে সোনার হারটা দেখছে। হাতের তেলোয় সোনটা বার বার ঘষছে। যতবার ঘষছে চামড়ায় একটা কালচে দাগ পড়ছে।

'কি হল ?' সুদাম বিড়বিড় করে প্রশ্ন করল।

'তোকে ঠকিয়েছে।' গম্ভীর হয়ে ভলটু উত্তর করল।' এক রত্তি সোনাও এতে নেই—পিতল—পিতলের হার।'

'ধেৎ ?' সুদামের কপাল কুঁচকে উঠল। 'দেখি, আমার হাতে দে।'

ভল্টু যেমন করে হাতের তেলোয় ঘষে ঘষে সোনা পরীক্ষা করছিল সুদামও সেভাবে জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘষে ঘষে পরীক্ষা করতে লাগল। তার পর এক সময় তার চঞ্চল হাত দুটো স্থির শক্ত হয়ে গেল। তার সমস্ত শরীরটাই যেন কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল।

হাত থেকে হারটা মাটিতে খসে পড়ল। সেটা কুড়িয়ে নিতে সে একটুও চেষ্টা করল না।

ভল্টু হো হো করে হাসতে লাগল।

'খুব জব্দ করেছে তোকে—বোকা বানিয়ে ছেড়েছে—পোদ্দারের মেয়ে পেতলের হার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিল—তার মানে তোর অভিনয় কাঁচা ছিল--মেয়ে টের পেয়ে গিয়েছিল তুই আদর করতে গিয়ে, চুমু খেতে গিয়ে ওর গলার হার ছিনিয়ে নিবি —'

সুদাম বোকা হয়ে বসে রইল। সে বলতে পারল না, ভূষণ পোদ্দারের মেয়ের গলার হার না এটা। বিমলার হার। শোভাদের নীচের তলার ভাড়াটের বৌ'য়ের গয়না।

'চলি—চল্লাম—' ভল্টু উঠে দাঁড়াল। 'তুই একটা বুদ্ধু—তোকে দিয়ে কিস্সু হবে না।' ভল্টু আর দাঁড়াল না। তেঁতুল তলা ছেড়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। অনেকক্ষণ একভাবে চুপ করে বসে থেকে সুদাম কাঠের বাক্সটার ওপর শুয়ে পড়ল। ঘেয়ো কুকুরটা ফিরে এসে আবার দিব্যি টান টান হয়ে আর একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর শুয়ে পড়ল। ছুঁচোটাও বেরিয়ে এসেছে। সুদাম সব দেখল, কিন্তু নড়ল না, উঠল না। আর ওদের তাড়া করল না। তার চোখ ফেটে তখন জল এসেছে। কেবল নিজের কথা ভাবছে সে। এমন ব্যর্থ অসার জীবন তার মতন আর কারুর না। পাপের ফল, পাপের শাস্তি? ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে সে। তাই কাঁদতে লাগল। ছেলেবেলায় সে গল্প শুনত দস্যু রত্নাকর পাপ করেছিল। কিন্তু অনুতাপ অশ্রুজলে তার সব পাপ ধুয়ে গেল। যেন এমন একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে সেও কাঁদতে আরম্ভ করল। যদি আবার সে ভাল হয় মানুষ হয়। একটা সুন্দর জীবন নূতন জীবন ফিরে পায়। মাথার ওপর তেঁতুলপাতার ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র ঝিকমিক করছিল। আলোর দিকে চোখ তুলে দিয়ে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

সমাপ্ত